

সংবাদ প্রতিদিন
১০ জানুয়ারি ২০১০
রবিবার
ক্রিকেট
সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com


অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
উপহার কেনা আর সময়সাপেক্ষ নয়।
Gifty
GIFT VOUCHER
যেকোনো মূল্যের পাওয়া যায়। সবরকম গয়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
যোগাযোগ করুন স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে।
জুয়েলারী ইনসেনটিভ স্কীমে
মাসে মাসে ১০০, ২৫০, ৫০০, ১০০০ টাকা
বা তার বেশীর কিস্তিতে ধাপে ধাপে টাকা জমান।
১২ মাস টাকা জমালে
১ মাস ফ্রি !!
*শর্তাবলী প্রযোজ্য।
গোলপার্ক - ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ১৭৯২
শোভাবাজার - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক বি.ই. - ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬
সল্টলেক এইচ.এ. - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫
হাওড়া পঞ্চাননতলা - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১
বারাসাত - ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।
দোকান রাত ৮.০০ পর্যন্ত খোলা।
www.anjali.bz
Mayurakshi/282/10

প্রতিদিন

রোববার

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী,
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, বিপুল গুহ, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার, শান্তনু দে, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

ফার্স্ট পার্সন ঋতুপর্ণ ঘোষ

যুদ্ধের প্রতি আমার যেমন কোনও আকর্ষণ নেই, ক্রিকেটের প্রতিও তাই।

ফুটবল খেলাটা তবু একটা উন্নত ধরনের হাডুডু-র মতো খেলা মনে হয়। তাতে হুটোপুটি ধাক্কাধাক্কি সব আছে, তবু সব বিকেলের খেলাই যেমন সন্ধে গড়িয়ে এলে শেষ হয়, ছেলেপুলে বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসবে বলে ফুটবল ম্যাচও যেন অস্তমিত সূর্যের ইঙ্গিতেই পাট চুকিয়ে ফেলে—এতক্ষণ যে ক'জন ধুলোকাদা মাখা শরীরে এত দাপাদাপি করছিল মাঠ জুড়ে, তারা যেন বাড়ির ছেলে হয়ে যায় আবার। মা বকবে বলে ঘেমো গেঞ্জি ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে খোঁচা খোঁচা চুল আঁচড়ে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ক্রিকেট খেলাটা যেন সত্যিই যুদ্ধ। সাজে-পোশাকে, প্যাড হেলমেট-এ আদ্যোপান্ত যোদ্ধাবেশ। বিভিন্ন ব্যূহ রচিত হচ্ছে যুদ্ধপ্রাঙ্গণ ঘিরে, মাঝখানে দুই প্রবীণ যোদ্ধা মুখোমুখি যুযুধান। সেনাপতি বা দলনেতা দু'পক্ষেই আছেন, তাঁরা সময়ে সময়ে দৃশ্যমান বা অন্তরালে। মহাভারতের কালে শঙ্খ বাজিয়ে যুদ্ধ শুরু হত নির্দিষ্ট মুহূর্তে, শেষ হত শঙ্খধ্বনিতে। ক্রিকেটের রণাঙ্গনও সেই দুই প্রারম্ভিক ও অন্তিম ঘোষণায় চালিত। ব্যাসদেব বা হোমারের কালে গ্যালারিতে বসে যুদ্ধ দেখবার নিয়ম ছিল কি না জানি না, কিন্তু এখানে আছে—এবং সেইসব দর্শক প্রত্যেকেই আসলে কেউ কোনও পক্ষের। প্রত্যেকের মনেই একজন নির্দিষ্ট নায়ক বা প্রতিনায়ক আছেন।

আছেন বিভিন্ন বিশেষ স্থানে উপবিষ্ট ধারাবিবরণকারী জানা সঞ্জয়, এক্ষেত্রে তাঁরা সমস্ত চক্ষুহীন (পড়ুন অনুপস্থিত), দর্শকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে চলেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খে বর্ণনা করে চলেছেন প্রতিটি বীরকীর্তি। যুদ্ধশেষে কেউ বা বিজয়ী, কেউ বা পরাজিত। দর্শককুলও সেই জয়-পরাজয়ে সমানে বিভক্ত— ফলত হর্ষিত বা বিষণ্ণ।

তবু ক্রিকেট খেলা যুদ্ধের মতো হলেও, যুদ্ধ নয়। যুদ্ধের প্রায় একটা নিখুঁত অভিনয় মাত্র। শৌর্য, বীর্য, ক্রোধ, অসূয়া—এই ভয়ঙ্কর রসায়ন কেবলমাত্র সেই নির্দিষ্ট জুটি প্রারম্ভিক ও অন্তিম ধ্বনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারপর নায়করাও মানুষ, প্রতিনায়করাও অতি সদাশয়।

যাঁরা ক্রিকেট ভালবাসেন তাঁরা কেউ বুঝিয়ে বলতে পারেননি আমায়—কী তাঁরা আলাদা করে ভালবাসেন। প্রিয় দলের প্রতি আনুগত্য, রণকৌশলের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, না কি যুদ্ধের উত্তেজনা।

যদি আমি ক্রিকেটকে একটুও ভালবাসি, তা বোধহয়—রোজকার এই যুদ্ধটা আপাতশান্তিতে শেষ হয় বলে। আজকাল অবশ্য তা-ও খুব একটা হয় না।

মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল এক ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য, যে ধর্মের গতি সত্যিই 'অতীব সূক্ষ্ম'। কিন্তু সে-ধর্ম কোনও অন্ধবিশ্বাস নয়। ক্রিকেটের মধ্যে যে ধর্মের অনুপ্রবেশ দেখি সে অন্য ধর্ম—মাঠের বাইরে এসেই যে ধর্ম কোনও বিশ্ববিস্ফোরক রূপ নিতে পারে।

তখন আমার বড় ভয় করে।





পরিচয়, ভাল লাগা বইটির সঙ্গে

এক যে আছে স্বপ্নের উপন্যাস। এক নায়ক লর্ড বায়রন। অন্য নায়ক শেলি। লিখেছেন শেলির বউ, ফ্র্যাঙ্কেনস্টেন-এর লেখক, মেরি শেলি। উপন্যাসটির নাম, 'দ্য লাস্ট ম্যান'। দুই ইংরেজ কবির অবিশ্যি উপন্যাসে অন্য নাম। বায়রনের নাম রেমন্ড। আর শেলি, অ্যাড্রিয়ান।

তখন সত্তরের দশক। তখন কলকাতা উত্তাল। রোজ খুনোখুনি। বদলে যাচ্ছে কলকাতার মুখ। চারধারে আতঙ্ক। থাকতাম শ্যামপুকুর লেনে। শ্যামপুকুর স্ট্রিটে, আমাদের বাড়ির কাছেই, খুন হলেন হেমন্তকুমার বসু। সেই দিনই, মনে আছে, হাতে এল 'দ্য লাস্ট ম্যান'। পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে কখন নিভে গেল পরিচিত চারপাশ। মেরি শেলি-র অনন্য ভাষা, কাহিনি-বিন্যাসের অনর্গলতা, পাতলা আচ্ছাদনে আবৃত স্বয়ং বায়রন আর শেলি-র বন্ধুতা আর বিরোধ, মেরির কলমে শেলির মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা, কনস্ট্যানটিনোপ্‌ল-এ বায়রনের শেষ দিন—এইসব কিছুর টান আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ২০৭৩-এ! যখন শুরু হচ্ছে এই উপন্যাসের গল্প। ইংল্যান্ডের শেষ রাজা জনমতের চাপে বাধ্য হয়েছেন সিংহাসন ছাড়তে। শুরু হয়েছে সাধারণতন্ত্র। রাজতন্ত্রবিরোধী শেলি যা চেয়েছিলেন, মেরি তা-ই ঘটিয়ে দিলেন ২০৭৩-এর ইংল্যান্ডে।

১৮২২-এর জুলাই। ঝোড়ো সমুদ্রে ডুবল শেলির তরণী। শেষ হল শেলির জীবন মাত্র তিরিশ বছর বয়েসে। মেরি সবে পঁচিশ। ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন এক বছর পরে। সেই সময়ে মেরির মনের অবস্থার কথা আমরা জানতে পারি তাঁর 'জার্নাল্‌স' থেকে : আমি খুব চেষ্টা করি পড়তে এবং লিখতে। আমার ভাবনা অনড় অচল। এবং যা পড়ছি তা বুঝতে পারি না। এইভাবেই দিন কাটছে আমার। অন্ধকার মেঘ থেকে নেমে আসছে প্রবল বৃষ্টি। ন্যক্কারজনক আকাশটার মতো বিমর্ষ আমার মন।

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ জ্বলে উঠল আলো। মেরি-র উপন্যাস ফ্র্যাঙ্কেনস্টেন-এর নাট্যরূপ 'হিট' হয়ে গেল লন্ডনে। ইংলিশ অপেরা হাউস-এ আকস্মিক সাফল্যের আঁচ পেয়ে লি হান্ট-কে লিখলেন মেরি : 'But lo and behold! I found myself famous—Frankenstein had prodigious success as a drama.' নতুন লেখায় হাত দিলেন মেরি। ১৮২৬-এ প্রকাশিত হল 'দ্য লাস্ট ম্যান'।

যদিও 'দ্য লাস্ট ম্যান'-এর পটভূমি ২০৭৩, তবু অনেকটাই আত্মজৈবনিক এই উপন্যাস। আমি অন্তত এই উপন্যাস একাধিকবার পড়েছি শেলি আর বায়রনকে মেরির চোখে একেবারে কাছে থেকে দেখার জন্য। এবং আমার ধারণা উপন্যাসের গল্পকে স্বাভাবিকভাবেই ছাপিয়ে উঠেছেন অ্যাড্রিয়ান নামে শেলি, রেমন্ড নামে বায়রন। 'দ্য লাস্ট ম্যান'-এর গল্পটাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। এক, ২০৭৩ থেকে '৯৩-এর মধ্যে এক ভয়ঙ্কর প্লেগে সমস্ত মানবজাতির বিলুপ্তি। শুধু বেঁচে লিওনেল ভার্নে, যে-গল্পটা বলছে। দুই, শেলি আর তাঁর গুণমুগ্ধ কিছু নারী-পুরুষের প্রতি মেরির নিজস্ব ঋণাঞ্জলি। ভার্নে এবং তার স্ত্রী আইড্রিস-এর মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি এমন এক মেরি শেলি-কে, যাকে আগে আমি চিনতাম না। উপন্যাসে ভার্নে এবং আইড্রিস দু'জনেই আরশির মতো, যেখানে মেরির ছায়া দেখা যায় সহজেই। তিন খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসটির কলেবর কম নয়। প্রথম খণ্ডে, ভার্নে, রেমন্ড আর অ্যাড্রিয়ান-এর পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবন। দ্বিতীয় খণ্ডে, জগৎ জুড়ে ক্রমশ অসুখ ছড়াচ্ছে, মারা যাচ্ছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ। তৃতীয় খণ্ডে, বিদায় সভ্যতা—বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, শিল্প, সব কিছু থেকে বিদায়। সামনে অন্ধকার লুপ্তির পথ। এখানে 'দ্য লাস্ট ম্যান' উপন্যাসের দু-চার লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না : We must all die; nor leave surviror nor heir to the wide inheritance of earth. We must all die! The species of man must perish; his frame of exquisite workmanship; the wondrous mechanism of his senses; the noble proportion of his godlike limbs; his mind; the throned king of these must perish.

মেরি কেন লিখলেন এমন তিমিরাবৃত নির্মম উপন্যাস? কোন বীজ থেকে মেরির কল্পনায় জন্মেছিল 'দ্য লাস্ট ম্যান'? সে আর এক গল্প, সংক্ষেপে বলছি। ১৮১৮-র ডিসেম্বর, শেলি আর মেরি নেপল্‌স-এ। ওঁরা গাইড নিয়ে ঢুকলেন এক গুহার মধ্যে—যেটা নাকি সিবিল-এর বিখ্যাত গুহা। কিন্তু সাজানো-গোছানো গুহাটাকে কিছুতেই ভার্জিল-বর্ণিত সিবিল-এর গুহা বলে ভাবতে পারলেন না শেলি আর মেরি। শেলি ছাড়বার পাত্র নন। গাইডকে বললেন, গুহার আরও ভেতরে যেতে। গাইড বলল, আরও ভেতরে যাওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়। ভেতরে শুধু অন্ধকার আর জল। ওখানে গেলে আর ফেরা যায় না। শেলি গাইডের হাত থেকে মশালটি নিয়ে নিলেন। মুগ্ধ মেরি চললেন শেলির পিছন-পিছন। পথ আরও সরু হতে লাগল। হঠাৎ নিভে গেল মশাল। 'Our torch was extinguished by a current of air and we were left in utter darkness', লিখছেন মেরি শেলি। সেই অন্ধকারের মধ্যেই ওঁরা এগোতে লাগলেন। একটি নতুন গুহার মধ্যে এলেন ওঁরা। তখন অন্ধকারের মধ্যেও আবছা দেখতে পাচ্ছেন। হঠাৎ শেলির চিৎকার—This is the Sibyl's cave; these are Sybilline leaves! শেলির হাতে কয়েকটি গাছের পাতা, যার ওপর কী সব যেন লেখা। মেরি অবাক—শেলি পড়তে পারছেন সেই সব পুরানো আখর, প্রাচীন ক্যালডি ভাষার অক্ষর! শেলি মেরিকে পড়ে শোনালেন সিবিল-এর ভবিষ্যৎবাণী, কীভাবে ধ্বংস হবে মানবজাতি! সিবিলাইন ভবিষ্যৎবাণী-ই 'দ্য লাস্ট ম্যান'-এর বীজ। 'দ্য লাস্ট ম্যান' কেন লিখেছিলেন মেরি? মেরির নিজের উত্তর : 'to give form and substance to the frail and attenuated leaves of the Sybil.'

মেরি যা-ই বলুন, আমি মনে করি মেরি 'দ্য লাস্ট ম্যান' লিখেছিলেন তাঁর জীবনের দুই পুরুষকে কিছুতেই ভুলতে না পারার জন্য—একজন স্বামী এবং পরমবন্ধু শেলি; অন্যজন



ক্লান্তিহীনভাবে আকর্ষণীয়, তাঁর সব কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও—লর্ড বায়রন।

১৮২৪-এ মারা গেলেন বায়রন। তাঁর জার্নাল্‌স-এ মেরি লিখেছেন বায়রনের মৃত্যুতে তাঁর ব্যক্তিগত কষ্টের কথা। ঠিক দু-বছর আগে মারা গিয়েছেন শেলি। উপন্যাসে কিন্তু রেমন্ড (বায়রন) মারা যাচ্ছে অ্যাড্রিয়ান (শেলি)-এর মৃত্যুর আগে। বায়রন তাঁর নিজের মৃত্যুর পূর্বাভাস পাচ্ছেন মেরির উপন্যাসে। ক্লান্ত করুণ বায়রন বলছেন, 'আমাকে আর আসন্ন কোনও ঋতুর কথা বোলো না। এই আমার জীবনের শেষ শীত। বছরটা মনে রেখো, ২০৯২। ওই বছরটাই লেখা থাকবে আমার সমাধি-ফলকে। আমি বুঝতে পারছি, এসে দাঁড়িয়েছি অস্তিত্বের প্রান্তে। এরপর আগামী জীবনের রহস্যময় অন্ধকার, যার মধ্যে ঝাঁপ দেব আমি। আমি আমার পিছনে রেখে গেলাম সেই চোখ ধাঁধানো আলো, যা আমার শত্রুরা কোনওদিন মুছে দিতে পারবে না।' ২০৯২-তেও কিন্তু কনস্ট্যানটিনোপ্‌ল-এর যুদ্ধে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে-করতে মারা যাচ্ছেন বায়রন! আর শেলি মারা যাচ্ছেন এক বছর পরে, ২০৯৩-এর পালতোলা তরণী থেকে সমুদ্রে ছিটকে গিয়ে! মেরির বর্ণনায়, চারধারে শুধু অন্ধকার। মাঝে-মধ্যে বিদ্যুতের চমক অন্ধকারকে সামান্য হালকা করছে। আকাশ থেকে লাল-লাল আগুনের বল বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে ঝরে পড়ছে অন্ধকার সমুদ্রে। ছোট্ট নৌকোটা সেই তোলপাড় অন্ধকারের মধ্যে ভেসে গেল—যেখানে আকাশ আর সমুদ্র তিমিরে একাকার, lost in the chaotic mingling of the sky and the sea. ভার্নে-র চোখ দিয়ে মেরি শেষবারের মতো শেলিকে দেখলেন—শেলির জীবনের শেষ মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইলেন তিনি এইভাবে :

I thought I saw Adrian (পড়ুন শেলি) at no great distance from me, clinging to an oar. I dashed aside the waters as I strove to lay hold of him.

১৮২২-এর ঝোড়ো সমুদ্রে সেই ছোট্ট পালতোলা ডিঙিতে যদি শেলির পাশে থাকতেন মেরি! সেই ইচ্ছাপূরণ তিনি ঘটিয়েছেন তাঁর 'দ্য লাস্ট ম্যান' উপন্যাসে। শেলি-মেরি-বায়রনের গল্প-ই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে এই উপন্যাসের। শেলির আর বায়রনের মৃত্যুর পর ওঁদের কাহিনি বলার জন্য মেরি বেঁচে থাকেন। ভার্নে নামে এ-গল্প বলেছেন মেরি নিজেই।

দ্য লাস্ট ম্যান ● মেরি শেলি



গ্রানাদা থেকে মাদ্রিদ—১

এই লেখাটি খুঁজে পেলুম হঠাৎ পুরনো কাগজের মধ্যে একটা নোটবইতে, তারিখ ছিল ৮/৯/১৯৯৪। স্পেনের বিষয়ে আমি কখনও লিখিনি, তাই ভাবলুম আরও পুরনো এক নবনীতাকে এই নতুন বছরে আপনাদের সামনে এনে দিই। আজ এটাই যাক?

আলবের্টো

বসে আছি। অল্প বাদলা বাতাস দিচ্ছে তাই রক্ষে। ট্রেন তো সেই এগারোটায়। সে তার সময়ে আসবে। আমি ততক্ষণ কী করি এই অচেনা অজানা শহরে? এখন সন্ধে, সাইট সিয়িং-এর সময় বিগত। সারাদিনই অবশ্য ঘুরছি, শরীর এখন ক্লান্ত, পা চলছে না আর, কিন্তু মন এখনই ছুটি নিতে রাজি নয়। চোখ যতটুকু গ্রহণ করতে পারে তা-ই সই।

এটা একটা চক। শহরের মাঝখানে একটা প্লাজা। মাঝখানে ফোয়ারা উঠছে—ফোয়ারাকে ঘিরে এই ছোট্ট শহরের জীবন। চাদ্দিকে বেঞ্চি পাতা। কোনও বেঞ্চির ফোয়ারার দিকে মুখ। কোনও বেঞ্চিটা পথ চেয়ে বসে আছে। কোনও কোনও বেঞ্চ আবার দু'টোর কোনও দিকেই নয়। এই প্লাজার ভিতরেই তারা মুখোমুখি। আমার হাতে যেন অসীম সময়। এবং পেটে অসীম খিদে। এবং পকেটে খুবই নিতান্তই সীমিত মুদ্রা, কয়েকটা পেসেতো বাকি। এদিকে স্পেন দেখবার ইচ্ছে বহুদিনের। সেই যখন প্রায় কিশোরীকালে কেমব্রিজে পড়তুম, সেই তখনকার স্পৃহা। স্পেনই ছিল ছাত্রদের সবচেয়ে সস্তা বেড়ানোর জায়গা। (তিরিশ বছর হতে চলল প্রায়! ভাবলেই গা শিরশির করে ওঠে—অ্যা-তো-ব-য়ে-স?) বিলেতের ছাত্রছাত্রীরা তখন সুযোগ পেলেই ছুটিছাটাতে চলে যেত স্পেনে, পিঠে ব্যাকপ্যাক আর স্লিপিং ব্যাগ বেঁধে নিয়ে। স্পেনে বেড়াতে যাওয়া সবচেয়ে সস্তা ছিল। কেবল আমারই কখনও যাওয়া হয়নি। আমি তো একা গেলে হবে না, আরেকজনেরও সময় সুবিধে থাকা চাই। বিলেতে আমার ছাত্রাবস্থা ছিল সংসার করার সঙ্গে সঙ্গে। আমরা ছুটিতে যেতুম ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, কখনও বা কলকাতা, দিল্লি, শান্তিনিকেতন। মাত্র একবারই শুধু রেণুকা আর আমি নিজেরা নিজেরা গিয়েছিলুম সুইৎজারল্যান্ডে। কর্তা তখন একটা বই লেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের সেবার খুব মজা হয়েছিল। 'অপারেশন ম্যাটারহর্ন'-এ সেই কেচ্ছা কেলেংকারির কথা ছেপে ফেলেছি। আর একবার আমরা দু'তিনজন মেয়ে মিলে আয়ারল্যান্ডে যাচ্ছিলুম। যেতে গিয়েও যেতে পারিনি আমি, স্টেশনে যাওয়ার বদলে আমাকে হঠাৎ চলে যেতে হল হাসপাতালে, একটা আকস্মিক অস্ত্রোপচারের জন্য। দুঃখী দুঃখী ভাবে আমাকে ছাড়াই অন্যরা চলে গেল আয়ারল্যান্ড! আমি অবিশ্যি তার পরে একা একা বারদুই আয়ারল্যান্ডে গিয়েছি। এখন আমি থাকি স্বদেশে, এখন আমি মুক্তকচ্ছ, যথা ইচ্ছা তথা যা। কিন্তু ঝুঁটি যে টেনে ধরে রেখেছে চাকরি। ইচ্ছেমতো উড়ে যেতে দেয় না। এ যাত্রায় মরিয়া হয়ে স্পেনের টিকিট কেটে ভিসা করে ফেললুম। যাত্রা ইংল্যান্ড থেকে। টাকা হাতে এত কম, যে, খোঁজ করছিলুম স্পেনে কোনও চেনাশুনো লোকজন আছে কি না, দু'চারদিন যার স্কন্ধে অবতরণ করা চলে। আর ইন্ডিয়ান এমব্যাসি তো আছেই যদি বিপদে পড়ি।। ১৯৮৭-এ যখন যুগোস্লাভিয়াতে নোভি সাদ-এ একটা Oral literature-এর conference-এ যাচ্ছিলুম—নতুন এয়ারলাইন, মাদ্রিদের জন্য ফ্রি টিকিট দিয়েছিল। টিকিট ফ্রি, কিন্তু ভিসার দাম তিনশো টাকা। তখন সেটা অনেক। তাই সই। তবুও হল না যাওয়া যাওয়া হল না। কপালে থাকলে তো? হল না কেন? কেননা মাত্র একটিই দিন যুগোস্লাভ এয়ারলাইন্স মাদ্রিদ যায়, এবং সপ্তাহে একটিই দিন তারা কলকাতায় যায়। যদি মাদ্রিদ যাই, তবে ১৫ দিনের ধাক্কা। কলকাতার প্লেন মিস। হাতে একদম ছুটি ছিল না। কেমন করে যাই? তখনও যুগোস্লাভিয়া বলে দেশটি ধরাধামে ছিল। যুগোস্লাভ বলে নিজেদের মনে করতেন সে-দেশের বেশ কিছু মানুষ। যেমন স্লোভাকিয়া তো ছিলই, তবুও তো চেকোস্লোভাকিয়া বহুদিন অবিচ্ছিন্ন ছিল? ১৯৮৭-তে যুগোস্লাভিয়ায় সার্বো-ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় বই বেরুত, কবিতার ম্যাগাজিন বেরুতো। সার্বরা, ক্রোয়াটরা খাঁটি যুগোস্লাভ বলেই নিজেদের মনে করতেন। তাঁদের শত্রু ছিল তুর্কিরা। কেন জানি না আমার বেলগ্রেড-নোভি সাদ ভ্রমণের কথা আমি লিখিনি কখনও। যেমন লিখিনি (১৯৭৪) চেকোস্লোভাকিয়ায় মেরিনার, পোপোভিচের, বা (১৯৭৬) হাঙ্গারিতে লাস্‌লোর গল্প।

দেশ ভ্রমণের গল্পও এটা ঠিক নয়। এটা হঠাৎ পাওয়া পথের সাথী কিছু মানুষের গল্প। জায়গাটা স্পেনের দক্ষিণে, গ্রানাদা। স্পেনের মাঝামাঝি, টোলিডো, আর মারিয়া আংগুলোর কথাও লিখতে হবে কখনও। মারিয়ার দাদা সাহিত্যের অধ্যাপক হার্ভার্ড-এ, তিনি আমাকে তাঁর নাম-ঠিকানা-টেলিফোন নম্বর দিলেন। মাদ্রিদে মারিয়ার আদরে ছিলুম যাওয়ার পথে। মারিয়ার সঙ্গেই দেখেছি প্রাদো, তার গাড়িতে গিয়েছি টলেডো-তে, আর

হেঁটেছি মাদ্রিদের পথে পথে, কফি হাউসে, বার-এ। গ্রানাদা থেকে ফেরার পথে একরাত্রি আমি ছিলুম ভারতীয় দূতাবাসে অতিথি। রাষ্ট্রদূত নিজে কলকাতাতে পড়াশুনো করেছেন, দার্জিলিং-এর ছেলে, আমাকে খুব যত্ন করেছিলেন। সেখানেই দেখা হয়েছিল সাইকেলে বিশ্বভ্রমণরত এক বঙ্গসন্তানের সঙ্গে।

সারাদিন হাঁটতে হাঁটতে আমার খিদে পেয়ে গেছে, একটা বেকারি থেকে রুটি কিনেছি—সঙ্গের বোতলে কেনা জল আছে। ওয়াইন হলে ব্যাপারটা ক্লাসিকাল হত, কিন্তু রেস্ত নেই। বেঞ্চিতে বেশ করে বাবু হয়ে পা তুলে গুছিয়ে বসেছি, শুকনো রুটি জলে ভিজিয়ে অমৃত মনে করে খাচ্ছি। অর্থাৎ সে-রাত্রের ডিনার সারছি। তারিখটা ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ (ভাদ্র ১৪০১), শহরের নাম গ্রানাদা। হ্যাঁ, সেই গ্রানাদা—দক্ষিণ স্পেনের ছোট্ট শহর—গার্থিয়া লোরকার জন্মস্থান, আর বিশ্ববিখ্যাত তুর্কি প্রাসাদ আলহামব্রাও এইখানেই অবস্থিত। আরও আছে অনেক কিছু। অপূর্ব কারুকার্যখচিত এক সুপ্রাচীন তুর্কি মাদ্রাসা—একেবারে ক্যাথিড্রালের বিপরীতে, রাজকীয় চ্যাপেলের উল্টো দিকেই, অবাক হয়ে দেখতে হয় তার আর্কিটেকচার—'ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়'। গ্রানাদাতে এখনও গোটা একটি আরব পাড়া আছে। সেখানে রয়েছে তুর্কিদের প্রাচীন স্নানঘর। ইংলন্ডের বাথ শহরে দেখেছিলুম রোমান বাথ, সে এক দারুণ বস্তু। গুজরাতের ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া অসামান্য কারুকার্যখচিত চৌকো পুকুরের মতো স্নানঘর রয়েছে, রূপ আর রহস্য আজও চোখ থেকে ঘোচেনি। আর লাল কেল্লার বাদশা বেগমদের বিলাসবহুল জাফ্রি কাটা দেয়াল, আর সুগন্ধি ফোয়ারাওয়ালা মর্মর স্নানকক্ষগুলির কারুকাজ নিয়ে বলার কিছু নেই। এবারে দেখি টার্কিশ বাথ কী ব্যাপার। নাম তো শুনেছি বহু। তুর্কিতে গিয়েছি বটে একবার, সোফিয়া মসজিদ আর ময়ূর সিংহাসন দেখেছি ইস্তাম্বুলে, এশিয়া ইয়োরোপের সীমারেখা, বসফরাস খাল-এর পাড়ে বেড়িয়েছি, তখন তো আমি ছেলেমানুষ মেয়ে। সেবারে টার্কিশ বাথ দেখার কথা মনে আসেনি। এখন আমি বড় মেয়ে, ম্যাপ দেখে হেঁটে হেঁটে সেতু পেরিয়ে অলিগলি ঘুরে যখন সেখানে পৌঁছুলুম, হায়, আমার এত শখের স্নানঘর তখন বন্ধ। সিয়েস্তার সময় হয়ে গিয়েছে। ইটালি আর স্পেনে দুপুরে সবাই সব ব্যবসাপাতি বন্ধছন্দ করে ঘুমোয়। খুলতে দুই ঘণ্টা। আমার তত সময় কোথায় হাতে? লোরকার বাড়ি দেখতে যেতে হবে না? ফলে আর টার্কিশ বাথ পরিদর্শন হল না, মাঝ থেকে আমার স্নানটাও করা হল না। এখানে রোদ চড়া, বেশ গরম বাপু, স্নান না করে কষ্টে আছি। আশা ছিল টার্কিশ বাথ নিয়ে নেব! দুরাশাই বটে। আসল কথাটাই জানি না অবশ্য, স্নানঘরটা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য চালু আছে কি এখনও? আরব পাড়াতে আরব জিনিস বলে ধরেই নিয়েছি চালু আছে। স্নান করার ইচ্ছে ছিল ১০০%, প্ল্যান ছিল সেটাই। আজও স্নান হল না।

হবে কেমন করে? কোনও হোটেলে তো উঠিনি? এদিকে গরম প্রচণ্ড। সারাদিন ঘুরি শ্রীচরণকমল দু'টির ওপরে ভরসা করে—চটি পায়ে হেঁটে, আর সারারাত ট্রেনে বসে বসে নিজেই নিজের পা টিপি, মলম লাগাই। বসার সিটের টিকিটে এসেছি কিনা? দিনে বেড়াই, রাতে ট্রাভেল করি। এতে হোটেল-খরচ বেঁচে যায়। শোওয়ার সিট আর বসার সিটের প্রায় একই ভাড়া। ইচ্ছে ছিল শুতে, কিন্তু এত দেরিতে শোওয়ার সিট পাওয়া যায়নি। এখানে তো আমার বক্তৃতা নেই, টিকিট দেবে কে? স্নানটা একটুখানি কাক-চড়ুই পাখিদের মতন হয়ে যাচ্ছে ক'দিন ধরে। দাঁত মাজার সময়ে ভক্তিভরে মাথায় মুখে হাতে জল ছিটিয়ে, কনুই অবধি হাত ধুয়ে, পা দু'টো মুছে, ওঁ শ্রী শ্রী গঙ্গা দেব্যৈ নমো নমঃ। আর পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ! গ্রানাদা অঞ্চলে এসে একটিও উপমহাদেশীয় (অর্থাৎ ভারতীয়, নেপালি, বাঙলাদেশি, পাকিস্তানি, সিংহলি) সহোদর-সহোদরার পাত্তা পাইনি। হ্যাঁ, মাদ্রিদে ৯ জন বাংলাদেশি ভাই পেয়েছিলাম। তারা পথে পথে পার্কে পার্কে পসরা পেতে বসে কত কী ফেরি করে বেড়ায়—আর পুলিশ দেখলেই সওদা গুটিয়ে পাঁইপাঁই করে ছুট লাগায়। তাদের ৪ জন হিন্দু ছেলে, ৫ জন মুসলমান। তাদেরই সঙ্গে ছিল ৩/৪ টি আফ্রিকান ছেলেও। তারাও ঠিক ওইভাবেই, ওই একই সওদা বেচছে (ভারতীয় স্কার্ট ও মালা), ওইভাবেই ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু সে তো মাদ্রিদের কথা। মাদ্রিদ হল বড় শহর, স্পেনের রাজধানী। মাদ্রিদ নাকি সমগ্র দেশের, পুরো স্পেনের ভৌগোলিক কেন্দ্রবিন্দু। একেবারে বৈজ্ঞানিক হিসেব মাফিক বেছে নেওয়া, এক পাগলরাজার কীর্তি। মাদ্রিদের পাশে ব্যবসার কোনও দরজা খোলা নেই, অর্থাৎ না আছে নদী, না আছে সমুদ্র। সাধারণত দেখা যায় রাজধানী তৈরি হয় নদীর তীরে, কি বন্দর দেখে। এটা হয়েছিল অঙ্ক কষে। রাজধানী দেশের ভৌগোলিক কেন্দ্রবিন্দুতে হওয়া এই কারণে তাঁর জরুরি মনে হয়েছিল যে, সেখান থেকে রাজার নজর রাখার পক্ষে দেশের সব দিকই সমান দূরত্বের হবে। রাজা সব প্রজাদের সমদৃষ্টিতে দেখতে পারবেন। রাজামশাই দার্শনিক ছিলেন, বাণিজ্যবুদ্ধিতে হিসেবি ছিলেন না। স্পেনের গল্প করতে শুরু করলে মুখ বুজবে না। আজ শুধু আলবের্টোর গল্প বলি। আমি তো আপন মনে রুটি চিবুচ্ছি, ঠিক যেন অমৃত আস্বাদন করছি। বেঞ্চিতে আমি কিন্তু একা নই। লাঠির ওপর থুতনি রেখে এক ভদ্রলোকও বসে আছেন একটু দূরে। আমি যতবার তাঁর দিকে দেখি তিনি ততবারই আমার দিকে চেয়ে গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাস্য করেন। হাস্যটি কেন? আমি ভিকিরির মতন শুকনো রুটি-জল খাচ্ছি বলে কি? না কি উনি ভদ্রলোক, বন্ধুত্বপূর্ণ হাসিতে অমায়িক আপ্যায়ন জানাচ্ছেন? আমি বেশিক্ষণ ভাবনাচিন্তা করতে পারি না, দিলুম ফ্যাক করে হেসে। উনি সঙ্গে সঙ্গে লাঠি নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে ঘেঁষটে এলেন আমার কাছাকাছি।

অতএব, ভাল করে শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে মুখটা নিরীক্ষণ করে দেখতে হল। বয়েস হয়েছে। দেখে মনে হল মানুষ ভালই। কোনও বদ উদ্দেশ্য সম্ভবত নেই। অন্তত এখন অবধি। রাত ৮টা বেজে গেছে। আকাশে বাতাসে ওটা কি বিকেলের আলোর আহ্লাদ, না এটা সূর্যিঠাকুরের অবসরের আগে গেরুয়া গোধূলি? প্লাজা-তে বাচ্চারা খেলছে। তাদের কিচিরমিচির এতই জোরালো যে সন্ধ্যার পাখির কিচিরমিচির যেন ডুবে যাচ্ছে। আকাশ দিয়ে মাঝে মাঝে পাখির মালা উড়ে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না কিছুই। কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছেন কুকুরের মালিকেরা। কুকুরের মালিকদের সব দেশেই একরকমের দেখতে লাগে কেন যেন। আমাকেও কি অমনি দেখায়? আলবের্টো হঠাৎ নিজের বুকে লাঠিটা ঠেকিয়ে বললেন—'আলবের্টো।' তারপর আমার কপালের টিপের দিকে লাঠি উঁচিয়ে বললেন—'ইন্দিয়ান? হিন্দু?'—অভ্যাস বড় দোষ। কেন যে মরতে টিপটা পরি এই জগৎজোড়া মৌলবাদী দুঃসময়ে। কে জানিত যে এই একফোঁটা লাল রংয়ের মধ্যে রাজনীতি, ধর্মনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সব গেরো বেঁধে আছে। হিন্দুয়ানির লক্ষণ হয়েছেন তিনি। এবং স্বদেশের পতাকা। দূর দূর। টিপটা কপাল থেকে (Sticker বিন্দি পরার এটাই খুব সুবিধা—যশোধরা বলেছিল, 'কখনও ইচ্ছে করলে টিপটাকে তুলে চুলকেও নিতে পারিস কপালটা', সিঁদুরে বা মাদ্রাজী কুমকুমে যা সম্ভব নয়) তুলে ফেললুম, এবং নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে গড়গড়িয়ে লেকচার দিলুম, 'নবনীতা। ইন্ডিয়ান।—ওনলি ইন্ডিয়ান—নো হিন্দু মুসলিম, নো ক্রিশ্চিয়ান জুডেইক, ওনলি নবনীতা, ওনলি ইন্ডিয়ান'—তার পরে আবার টিপটা লাগাই কপালে। আমি কথা বলছি আর ভাবছি আলবের্টোর তো ইংরিজি জ্ঞান নেই, আমার অতি সরল করে বলা ইংরিজিও হয়তো তিনি অনুধাবন করবেন না। আলবের্টোর ষাট পেরিয়েছে মনে হয়। সাদাপাকা ঝাঁকড়া গোঁফ, গালে সাদা পাকা দাড়ি, চুল আছে কি না জানি না—মাথায় সবুজ বেরে-টুপি, চোখে শেলফ্রেমের চশমা। হাতে পালিশকরা লাঠির মুন্ডুটি ঝকঝকে পেতলে বাঁধানো। পরনে ভদ্র টাই আছে, জ্যাকেট-সহ। কিন্তু পায়ে রানিং শু—কেম্বিসের জুতো। বোধহয় হাঁটতে বেরিয়েছেন। তিনি জ্যাকেট, টাই পরলে কী হবে, এই প্লাজা-তে তরুণী মায়েরা গরমের দোহাই দিয়ে প্রায় নগ্ন পোশাকে সেজেগুজে, দু-তিনজন মা একসঙ্গে দল বেঁধে পুতুলের মতো বাচ্চাদের প্র্যামে ঠেলে, কি হাত ধরে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বাবারা ধারে-কাছে নেই। ক্যাথলিক নীতির কল্যাণে এখানে শিশুদের বেশ বোলবোলাও চোখে পড়ে। নানাবয়সি বাচ্চারা ছুটে ছুটে খেলছে। হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি করছে। মনের সুখে চেঁচাচ্ছে।

আর আছেন কুকুরপ্রেমীরা, তাঁরা তাঁদের প্রিয় জীবদের সান্ধ্যভ্রমণে নিয়ে এসেছেন। কুকুরদের আচার-আচরণ এবং কুকুরদের মালিকদের আচার-আচরণ কিন্তু দেখবার মতন। কুকুররা সত্যিসত্যিই সামাজিক ভদ্রলোক। মিশুক, ধনী-দরিদ্র ফারাক করে না, চেনা-অচেনা তফাত করে না, বন্ধুত্বপূর্ণ পায়ে, চোখভর্তি ভালবাসা নিয়ে, আকুল হয়ে সবার কাছে ছুটে যেতে চেষ্টা করে। সামাজিক মানুষের যেমনটি হওয়া উচিত। আর তাদের মনিব-মনিবানী? ওহ্! কুকুরওয়ালাদের অহংকার আর চালিয়াতি দেখলে হাসিও পায়, কান্নাও পায়, পিটুনিও দিতে ইচ্ছে করে। অমন সুসভ্য চতুষ্পদ প্রাণীগুলিকে দিনরাত চোখে দেখেও, ওরা শেখে না, ঈশ্বর মানুষদের কীভাবে সমাজজীবন যাপন করতে শিখিয়েছেন? রাস্তার কুচো কুচো গোল গোল কুকুরছানারা লাফিয়ে লাফিয়ে খেলতে আসছে ওদের সঙ্গে, আর কুকুরওয়ালাদের ছড়ির মার খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছিল ওদেরই ধরে মারি। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে রাস্তার কুকুর কিন্তু দেখিনি। এটা বিশেষ দ্রষ্টব্য মনে হল দক্ষিণ স্পেনে। এদের সব দেশে কুকুর মাত্রেই পোষ্যপুত্তুর। এমন সপরিবার ঘরছাড়া কুকুর দেখা যায় না তো? এ বেশ দিশি দিশি আবহাওয়া! আলবের্টোর সঙ্গে কুকুর ছিল না। আমারও না।

আস্তে আস্তে আমাদের ভাব হল। সেও ইংরিজি জানে না, আমিও জানি না তার ইস্পানী ভাষা। দু'জনে কিছু ভাঙা ফরাসি কিছু ভাঙা জার্মানে আর প্রভূত অঙ্গভঙ্গি সহকারে যথেষ্টই ভাবনার আদানপ্রদান করতে পারলুম। আলবের্টো বললেন তিনি ব্যবসায়ী। তাঁর দোকান আছে। আমি লিখি ও পড়াই শুনে ভীষণ খুশি হয়ে তিনি উঠে গিয়ে অন্য একজনকে ধরে আনলেন। কেন না আমার স্বগোত্র সে। সেও একটু একটু লেখে। আর ইস্কুলে পড়ায়। বেচারা তার বউ ছেলেপুলে এবং কুকুর নিয়ে একটু দূরের বেঞ্চিতে শান্তিতে বসেছিল। তার নাম ফ্রাঞ্চেস্কো। ফ্রাঞ্চেস্কো নিজের বুকে এক হাত আর আলবের্টোর বুকে অন্য হাত রেখে চিৎকার করে বলল 'আমিগো' তারপর বলল 'বেস্টফ্রেন্ড'। বহুল অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, জগতের সব মানুষেরই ধারণা চিৎকার করে বললেই সব অচেনা ভাষার কথাবার্তা সরল হয়ে আগন্তুকদের বোধগম্য হয়ে যায়। তারপর ফ্রাঞ্চেস্কো সহাস্যবদনে আমাকে দু'টো বিস্কুট অফার করল। সম্ভবত ওদের ওই অতি আদুরে, অতি আহ্লাদে, অতি অসভ্য কুকুরের জন্যই ছিল—আমি কিন্তু বিনাবাক্যব্যয়ে খেয়ে ফেললুম—ওই একইরকমের হাস্যবদনে 'গ্রাৎসিয়াস, মুচো গ্রাৎসিয়াস' বলতে বলতে। খাবার পরে খেয়াল হল, যদি বিস্কুটে বিষ থাকে? অচেনা লোকের দেওয়া জিনিস খেতে নেই, বিশেষ করে ভ্রমণের সময়ে। এ কথা কে না জানে? কিন্তু ধনরতন ভর্তি বাক্স প্যাঁটরা তো আমার নেই সঙ্গে। একটা চেঞ্জ, মাজন-বুরুশ-গামছা-সাবান-ওষুধপত্র-চিরুনি-ইনহেলার, আর পাসপোর্ট-ড্রাইভিং লাইসেন্স-বিদেশি টাকা—এই নিয়ে কাঁধে একটা ঝোলা মাত্র। কিন্তু মহামূল্য কিডনি দু-খানা তো আছে। সম্প্রতি পড়েছি এভাবে নাকি পথে ভাব জমিয়ে তারপর অজ্ঞান করে বিদেশিদের দু'টি কিডনিই কেটে নিয়ে তাদের রাস্তায় ফেলে রাখা হচ্ছে পশ্চিম গোলার্ধে। অবশ্য এ ঘটনা ঘটেছে আমেরিকাতে। স্পেনে এখনও এত দূর মরাল-টেকনিকাল-কমার্শিয়াল উন্নতির সংবাদ শুনিনি। তবে স্পেন এখন EEC Country তো! এইটুকু এগুতে আর কতক্ষণ? ভুক্তস্য শোচনা নাস্তি, আর ভেবে কী হবে, বিস্কুট তো দিব্যি পেটে চলেই গেছে! এখন দেখতে হবে যাতে কিডনি দু'টোও পেটেই থাকে। এখনও ট্রেনের ঢের দেরি। গ্রানাদা স্টেশনটি যা তা। এই সব প্লাজা কত সুন্দর। স্টেশনে নয়, আমি বাপু এখানেই বসে থাকব যতক্ষণ ট্রেন না আসে। আপাতত বরং হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে তো কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়বে না? দেহ সচল থাকলে হয়তো ওষুধের এফেক্ট কেটে যাবে। প্রথমে একটা কড়া কফি খাই। পয়সা যাবে, যাক—কিডনি তো থাকুক! উল্টোদিকেও একটা প্লাজা আছে, সেটা এমন ফাঁকা নয়। মস্ত মস্ত মেপ্‌ল গাছের নীচেগুলো বেদির মতন লাল ইট, আর সাদা-কালো পাথরে সাজিয়ে বাঁধানো। তাতে লোকজন বসে আছে গোল করে। তার চারপাশে সাদা চেয়ার টেবিল পাতা। আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে। পাশেই রেস্তোরাঁ আছে, সাজুগুজু করা বেয়ারারা ছুটোছুটি করে ধোঁয়া ওঠা কফি, শীতল বিয়ার আর রঙিন ওয়াইন আনছে টেবিলে। প্রচুর বয়স্ক মানুষ, এবং প্রচুর অল্পবয়সিরাও বসে আছেন সেখানে। দেখি, ওইদিকেই যাওয়া যাক আপাতত।

২.০১.২০১০

nabaneetadevsen@gmail.com

সংশোধনী : 'নিমন্ত্রণ' সংখ্যায় নবনীতা দেবসেন-এর লেখাতে কিছু কিছু অংশ বাদ পড়ে গিয়েছে। আগের ও পরের লাইনের সঙ্গে যোগ রেখে সেগুলো শুধরে দেওয়া হল : "আমার রান্নাবান্না তখন এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে, দ্রৌপদী হয়ে উঠিনি তখনও, তাই স্বপাক ভোজনে কিঞ্চিৎ দুঃখ ছিল। গৌরীদি অলরেডি দ্রৌপদী।" দারুণ খাওয়াদাওয়া, নিদারুণ আড্ডা, সবাই পরিতৃপ্ত।

নিবন্ধের শেষের আগের লাইনটি হল : "বাতিল টিকিটে তো আর ফিরে যাওয়া চলবে না। তুমি লেট। ডেট ওভার! আরেক চকচকে নয়া বর্তমানের খেলা চলছে জগৎ স্টেডিয়ামে।" সত্যিই তো, মা গো, কবে আর হবে থাকিতে জীবন—?


চো খ ধাঁ ধা নো
14027 Rs 150
14027 Rs 150
66224 Rs 220
14020 Rs 236
14027 Rs 150
Sreeleathers
bags and more
ছেলে এবং মেয়েদের
দুর্দান্ত বেল্ট
বিশাল রেঞ্জ
৭৫ টাকা থেকে শুরু
LADIES BAGS | CLUTCHES | PURSES | MAKEUP BOXES | JEWELLERY BOXES | TOILET BAGS | SHOPPING BAGS | TRAVEL BAGS | STROLLEY BAGS | SCHOOL BAGS | SPORTS BAGS | WAIST POUCHES | BELTS | WALLETS
BRIEFCASES | PORTFOLIOS | LEATHER JACKETS
KOLKATA | LINDSAY STREET ~ 2286 1511 | FREE SCHOOL STREET ~ 2286 1506 | COLLEGE STREET MARCAS SQUARE ~ 2219 7984 | BEHALA MARKET ~ 2468 1341 | GARIA BASU MARKET ~ 2430 3076
HOWRAH | CORPORATION STADIUM COMPLEX ~ 2641 0608 | DOMJUR | SRIRAMPUR | NAIHATI | BOKARO | GAYA | DURGAPUR | ASANSOL | BERHAMPUR | PURULIA | JAMSHEDPUR (KAMANI CENTRE) | DHANBAD
RANCHI | HAZARIBAG | BHAGALPUR | MUZAFFARPUR | PATNA | CUTTACK | ROURKELA | BHUBANESWAR | AGARTALA | VARANASI | RAIPUR | GUWAHATI | DELHI
ResponseIndia.Com

খেলার পড়া পড়ার খেলা

বইয়ের পাতায় পাতায় বেজে ওঠে ব্যাটের মধ্যিখানে বল লাগার মিষ্টি শব্দ। বঞ্চিত নায়করা বল করে যান জীবন নিংড়ে। ওভারশেষে তাকান পাঠকের দিকে।

তুমি তো মাঠের বাইরেই বসে থাকতে, তাই না? সাদা জামাপ্যান্ট পরে?

—তা থাকতাম। আর কেডসটা যাতে যথেষ্ট পরিষ্কার থাকে তাই খেলার আগের দিন রং লাগিয়ে রোদে শুকোতেও দিতাম। তারপর সোয়া ন'টার মধ্যে চান করে শার্ট-প্যান্ট পরে সাড়ে ন'টায় মাঠে।

—কিন্তু তুমি তো ছিলে ১৬ নম্বর প্লেয়ার, তোমাদের টিমে?

—না না, পনেরো নম্বর।

—কারণ আমি খেলতে পারতাম না। প্র্যাকটিসের সময় বল কুড়িয়ে দিতাম।

—বেশ, তোমার তা হলে তাতেই বেঁচে থাকার আনন্দ। নান্দীকার-এর একটা নাটক আছে, 'নানা রঙের দিন'। তাতে প্রধান চরিত্র, অর্থাৎ রজনী চাটুজ্যে নামের এক অভিনেতা, তাঁর সহ-অভিনেতাকে এক জায়গায় বলেন, আর প্রম্পটার হয়েই তোমার জীবন কেটে গেল কালীনাথ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে আছে।

—তোমারও তেমনি। বল কুড়িয়েই তোমার খেলার কেরিয়ার শুরু। বল কুড়িয়েই শেষ।

—একদিক দিয়ে সত্যি। কিন্তু মাঠের বাইরে বসে থাকাটাও জানো, একদম খারাপ নয়। ধরো, তুমি যদি জেনেই যাও, তুমি কিছুতেই মাঠে ঢুকতে পারবে না—কারণ, টুয়েলভ্থ ম্যান আছে, সে ঢুকবে। তারপরও ১৩, ১৪ আছে, তোমার দরকারই হবে না, তবে মনটা একরকম ফ্রি হয়ে যায়।

আমি কত কিছু দেখতাম।

—কী দেখতে?

—আমাদের মাঠ ছিল নদীর ধারে। নদীর ওপর দিয়ে বাতাস আসত। আমাদেরই বন্ধুরা দল বেঁধে মাঠে আছে। সাদা পোশাক পরা, শীতকালের শিশির তখনও ঘাসে। কেমন অন্যরকম দেখায় তাদের। কত যেন দূরের। আর কেমন যেন ভাল। কেমন যেন সুন্দর।

—রেডিওতে একটা নাটক হত, শুনেছ। 'কাক' বলে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই সময়টাই হত। বোধহয় কোনও ফরাসি নাটকের অনুসরণে লেখা। কার লেখা, কার অনুসরণ, মনে নেই।

—আমারও নেই। তবে, ওই নাটকে একটা শব্দ ছিল। নাটকের ব্যাপারটা মনে আছে তোমার!

—সেই যে দু'জন নারী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রী'র মতো থাকত। আর তাদের অশান্তি ছিল খুব। তাদের দরজায় এক রাত্রে এসে আশ্রয় নিল একটি আগন্তুক। সে আশ্চর্য সুন্দর সব কথা বলতে লাগল। জীবন সম্পর্কে উপলব্ধির কথা।

—তারপর হঠাৎ মরে গেল। মরার পর, তার আশ্চর্য সুন্দর কথাগুলো পুরুষটি কিছু কিছু বুঝছে। রমণী বুঝতে পারছে না। তখন পুরুষটি, তাকে বোঝানোর প্রাণপণ চেষ্টায় বলে, লোকটা ছিল : উঃ কী করে তোকে বোঝাই, লোকটা ছিল—যাকে বলে ভাববিলেসী! বুঝলি!

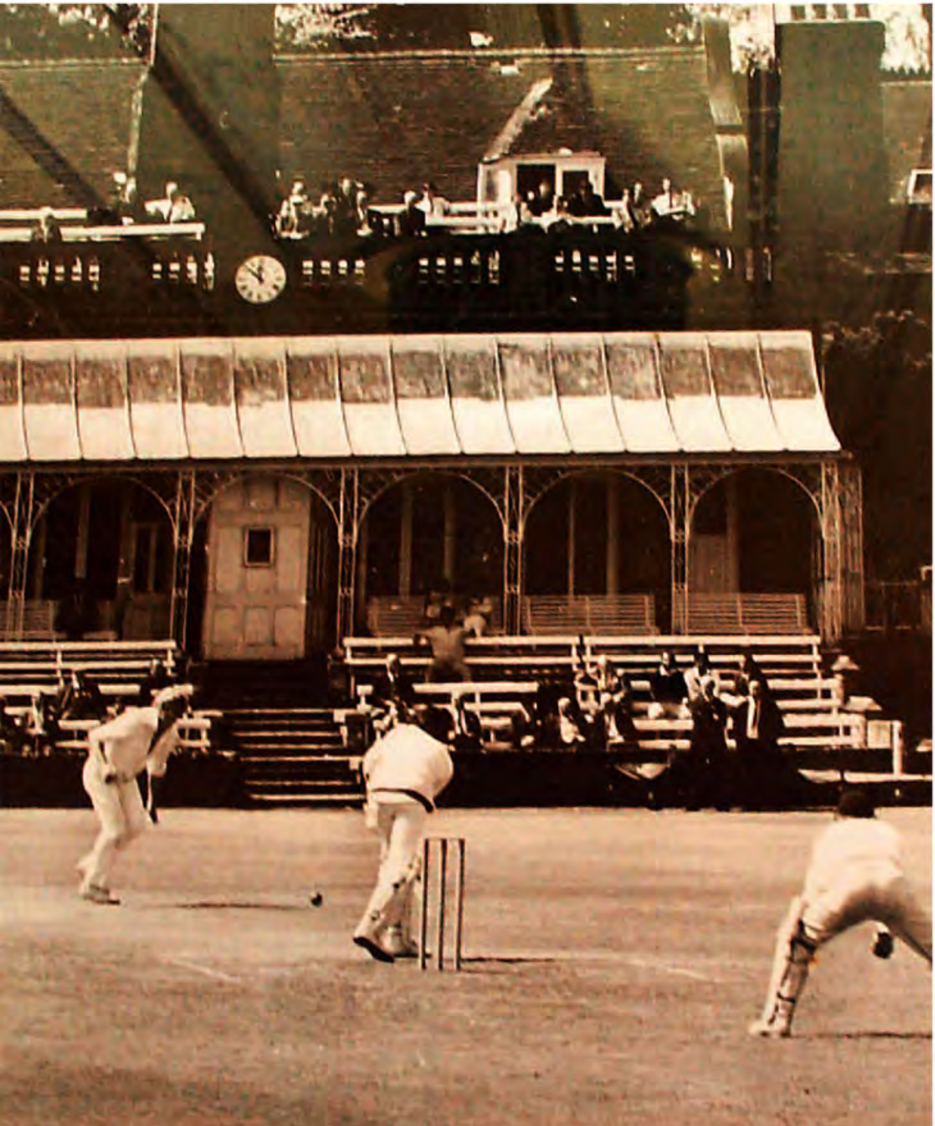
—হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। কথাটা ছিল বটে। বলতেন, শম্ভু মিত্র। উনি পুরুষের চরিত্রটা করতেন। নারী করতেন জয়শ্রী সেন। আর হঠাৎ এসে পড়া লোকটি হয়েছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

—সেসব কথা কে শুনতে চেয়েছে। বলছি, ভাববিলেসী কথাটা বুঝতে পারছ তো!



—হ্যাঁ, পারব না কেন!
—তা, তুমি কি শিশুকাল থেকেই ভাববিলেসী?
—আমি-ই? আমার কথা বলছ?
—বলছি, কারণ নদীর ধারে মাঠ। মাঠের ওপর হাওয়া। সাদা পোশাকের এগারোটা ছেলে। কেউ তোমার বন্ধু কেউ তোমার বন্ধুর দাদা। আর তাদের কী সুন্দর দেখাচ্ছে সকালের রোদ্দুরে, এগুলো কি ভাববিলাস নয়? নিজের মাঠের বাইরে বসে থাকাটা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা নয়!

—কী জানো, খেলতে পারতাম না বলে বাইরের জিনিসগুলো খুঁটিয়ে দেখতাম। মাঠের পাশে, সাদা চৌকো ছোট বাক্সের মতো একটা বাড়ি। তাতে একটা বারান্দা—লম্বা। তার সাদা সাদা গোটা চারেক থাম। ভেতরে একটা বড় ঘর। একটা ছোট। এইটুকু। পুরোটা মাঠ। মাঠের পরে ঢালুর শেষে নদী। তার মাঝখানে ওই ছোট্ট সাদা চৌকো বাড়ি। ক্লাবঘর। হ্যাপি ক্লাব নামে তো এই মাঠ। সেই হ্যাপি ক্লাবের ক্লাব-হাউস। চোখ বন্ধ করলে এখনও সব স্পষ্ট।



—তা হলে বলছ তুমি একজন দর্শক! সুযোগ পেলেই খেলা দেখতে যাও!

—না, দর্শকও ঠিক নই। খেলাও খুব দেখেছি তা নয়।

—সে কী। খেলতেও নামোনি। খেলাও দ্যাখোনি মাঠে গিয়ে। তা হলে?

—সামান্য দেখেছি। তবে টিভিতে অনেক নতুন পুরনো ম্যাচ তো দেখি। ব্রিসবেন টেস্ট নিয়ে যে ফিল্মটা আছে, ওটা দেখেছি। আসলে আমি এমন একটা জিনিসের মধ্যে দিয়ে ক্রিকেটকে দেখেছি, যেটা হয়তো, ওই, তুমি যা বললে—ভাববিলাস!

—কীরকম, কীরকম?

—যেহেতু নিজে খেলতে পারতাম না, আর তখন টিভিও ছিল না যে বড় খেলা দেখব—তাই আশ্রয় নিয়েছিলাম বইয়ের।

—ওঃ! তা হলে তো তুমি আসল ক্রিকেটের কাছেই ঘেঁষতে পারোনি। বইতে আর কী পাওয়া যায়। ও তো সাহিত্য।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। সাহিত্য! সাহিত্য-ই! খেলা কি না জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে কী করে কী করে ওর মধ্যে দিয়েই খেলাটার একটা উত্তেজনা কোথাও গায়ে এসে লাগত।

—আরে! মাঠের খেলার সঙ্গে বইয়ে পড়া খেলার তুলনা। তুমি কি পাগল হলে! মাঠের খেলার স্বাদ কি বইতে পাওয়া যায়? আর এমন অনেক বড় ক্রিকেটার থাকতে পারে, যে তত বেশি ক্রিকেটের বই পড়ে না। তার সময় কোথায়? খেলার জন্য তো খাটতে হয়। কোথায় মাঠের খেলা, আর কোথায় বইয়ে পড়া খেলা।

—যাকগে, আমি তর্ক করব না। আমি খেলোয়াড়ের কথা বলছি না। বলছি, খেলাটাকে উপভোগের একটা ধরনের কথা। জীবনকে যেমন সবাই একইভাবে উপভোগ করে না। ক্রিকেটকেও নানাভাবে উপভোগ করা যায়। কারণ, ক্রিকেট একটা জীবন!

—এই আবার সাহিত্যের কথা শুরু হল।

—তুমি যে বলছ, বইয়ে খেলাটাকে পাওয়া যাবে না, একেবারে পাওয়া যাবে না তা নয়। ধরো, মতি নন্দীর একটা ছোট ডিটেল-এর কথা বলছি, একজন কভার ড্রাইভ করেছে, তার বর্ণনা : 'দু'জন ফিল্ডার একটু দৌড়ে ছেড়ে দিল।' মানে বলটাকে। বাউন্ডারি হবেই। এই লাইনটা থেকে কি মাঠের ছবিটা দেখা যায় না, বলো?

—এটা অবশ্য ঠিক রিপোর্টের মতো নয়।

—না না, এটা তো একটা উপন্যাসে আছে। কিন্তু খবরকাগজে যখন রিপোর্ট লিখতেন মতি নন্দী, তখনও, আশ্চর্য সব লাইন পাওয়া যেত। যেমন ইংল্যান্ডের এক বোলারকে কলকাতায় এক ওভারে চারটে চার মারলেন ওয়াদেকর। কার বলে, সেটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। দু'টো অফ-এর দিকে দু'টো অন-এ। মতি নন্দী লিখলেন, একটা কেকের মতো মাঠটাকে চারভাগে চৌকো করে কেটে দিলেন ওয়াদেকর।

—বাঃ। এটা দারুণ তো।

—আবার দ্যাখো, এটা তো হল, '৭২-'৭৩-এ ভারতে আসা টনি লুইস-এর ইংল্যান্ড। তার ঠিক আগের সফরটায়, অর্থাৎ '৬৪-তে মাইক স্মিথের ইংল্যান্ড সফরের ওই ইডেনের একটা ওভারে বোরদের ব্যাটিং-এর কথা শোনো : 'একটা বেজে কুড়ি মিনিট—টিটমাসকে কভারে বাউন্ডারিতে পাঠালেন সানন্দে। সেই সুখশ্বাসে স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম বিউগল বাজল। পরের বল—আবার বাউন্ডারি—সুইপ করে। পরের বল—আবার বাউন্ডারি—মিড-অনে ড্রাইভ।

চারটে বাউন্ডারি, এক ওভারে। 'ক-বি-তা স্যর।' মুহূর্তে খেলা জেগে উঠল মৃত সঞ্জীবনীতে।'

—এটা? এটাও কি মতি নন্দী? তা তো নয় মনে হচ্ছে।

—না, মতি নন্দী নন। ইনি শঙ্করীপ্রসাদ বসু। কেন খেলাটা মৃত সঞ্জীবনীতে জেগে উঠল, তার আগে কী ঘটছিল সেটা একটু বলে দিই—তখন দলীপ সারদেশাই আর বিজয় মঞ্জরেকর ব্যাট করছেন। রানের গতি মন্থর। সেটা কেমন করে বলছেন দ্যাখো :

'মঞ্জরেকর দীর্ঘ সময় পারফিটের সঙ্গে নিষ্ফলা চিঠি-চালাচালি চালিয়ে গেলেন। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে শর্ট রান আদায় করতে প্রাণান্ত হল সরদেশাইয়ের। মঞ্জরেকর দু-একটা ড্রাইভ করলেন না তা নয়। কিন্তু গ্লান্স করলেন বেশি। গ্লান্স-কাজটা সবদিক বজায় রেখে করা যায়। ওই মারে পা বেশি ঘোরে না। ব্যাট বেশি নড়ে না। এবং স্কোর বোর্ডও ওঠ নামা অল্পই করে, কারণ ডিপ ফাইন লেগে লোক থাকেই। মঞ্জরেকরকে গ্লান্স করার সুযোগ বেশি করে দিতে লাগলেন নাইট, যিনি এগারোটার সময়ে হাই কোর্ট প্রান্তে লার্কারের স্থানে এসে প্রধানত ইনসুইঙ্গ বল করছিলেন।' —দেখেছ, গদ্যের কী বাঁধুনি। কী চমৎকার কৌতুক, ব্যাটসম্যানদের মনোভাব ও প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন সব কেমন মিলিয়ে-মিশিয়ে রাখা। এই শঙ্করীপ্রসাদের কৌতুকবোধ কেমন তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই খেলা এবং লেখা আরম্ভের একেবারে প্রথম বাক্যটি দিয়ে। 'মুদ্রা রাক্কস'—দাঁতে দাঁত পিষে মাইক স্মিথ বললেন পতৌদিকে। 'ব্যাপার কী? কিছু নয়। পাতৌদি তৃতীয় টেস্টেও টসে জিতেছিলেন। পরপর তিনবার টসে হেরে রাগ সামলাতে পারেননি মাইক স্মিথ।'

—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এখনকার কাগজে অত কাব্য করার জায়গা কোথায় পাবে তুমি? তা ছাড়া আরও কথা আছে। বোরদে, সারদেশাই, মঞ্জরেকর, পতৌদিকে না হয় চিনলাম—কিন্তু এরা কারা? এই টিটমাস, মাইক স্মিথ, নাইট, লার্টারে এ-সব কে?

—দাঁড়াও। দাঁড়াও। আরেকটা জায়গা শোনো, এটা পতৌদি সম্পর্কে। 'ভারতের তরুণ অধিনায়ক পাতৌদি নেমেছিলেন অতি মৃদু করতালির মধ্যে।...চশমা ও দায়িত্বে অস্থির পাতৌদি ধীরে-সুস্থে খেলতে লাগলেন। ...কুড়ি মিনিট পর এক রান করে পাতৌদি শূন্য হারা হলেন। তাতে যে করতালি পড়ল, মাঠের বাইরে থেকে নাকি মনে হয়েছিল সেঞ্চুরির সংবর্ধনা। অধিনায়কের ওপর ভরসা বটে। আর ভরসা থাকবে কী করে—বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে পাতৌদি যে জাতীয় শূন্য পুরাণ রচনা করে চলেছিলেন! পাতৌদির পূর্ববর্তী চার ইনিংসের হিসাব—০, ১৮-১০, ০—অ্যাভারেজ ৭। তবু দু'টো ঊনপঞ্চাশ মিনিটে উইলসনের বল অফে শর্ট করতে গিয়ে উইকেট কিপারের করতলগত হয়ে পড়লেন। ভারত—৭, ১৬৯। পাতৌদি-২। তাঁর অ্যাভারেজ অল্প কিছু নামল—ছিল ৭ হল ৬।' এই যে একটা মজা। কী চমৎকার না? কিংবা ধরো, নবীন চন্দ্রশেখর জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাট করতে নেমেছেন। তার ব্যাটিং সম্পর্কে কী বলছেন শঙ্করীপ্রসাদ? 'তরুণ লেগব্রেক-গুগলি বোলার চন্দ্রশেখর টিটমাসের বলে গোড়াতেই এক গুগলি স্ট্রোক করলেন। ব্যাট চালানো দেখে মনে হয়েছিল বলটা যাবে লেগের দিকে, গেল অফে।'

—কিন্তু বললে না তো এরা কারা? এই উইলসন। স্মিথ, মাইক! না শুনিনি! নেভার হার্ড অফ দেম।

—দ্যাখো, সমস্ত কবিই যেমন ইতিহাসে স্থান পান না, কালের নিয়মে বিলুপ্ত হয়ে যান, অনেক খেলোয়াড়ও তেমনি। এই যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের কথা বলছি, এঁরা পঞ্চাশের দশকে খেলা শুরু করেছিলেন, ষাটের দশকেই এঁদের টেস্ট-জীবন। '৭০-এর প্রথম থেকেই এঁরা বিদায় নেন। পতৌদির কথা আলাদা। এঁদের রেকর্ডই বা এমনকী বলো! আজকের যে ভারতীয় ক্রিকেট, তার কাছে এঁরা কিছুই নন। কিন্তু এঁরা ছিলেন। আমার কাছে এঁরাই ছিলেন অনেক। পতৌদি এত যে বড় ক্যাপ্টেন, ক'টা সেঞ্চুরি? ছ'টা। মাত্র ছ'টা। কিন্তু আমি বলছি একটি শট-এর বর্ণনা করছেন শঙ্করীপ্রসাদ—পতৌদির দ্বিতীয় ইনিংসের একটি লেট কাট-এর, কিন্তু পতৌদির দ্বিতীয় ইনিংস পুরোটাই শোনো শঙ্করীপ্রসাদের মুখ থেকে :



আর বাঙালি যে কতখানি দায়িত্বহীন প্রেমিক, তাও প্রমাণ হয়ে গেল পঞ্চম দিনে পাতৌদি সম্বন্ধে তার মনোভাবের পরিবর্তনে। স্টাইল সম্বন্ধে বাঙালির অনপনেয় আসক্তি। জয়সীমার জায়গায় পাতৌদি যখন নেমেছিলেন, উপেক্ষা ছাড়া কিছু পাননি। পাঁচ মিনিট পরে টিটমাসের বলে কোনওক্রমে একটি রান নিয়ে যখন 'একশ্চন্দ্রের' উদয় ঘটালেন রান-গগনে, তখন সেটাকে 'নষ্টচন্দ্র' বলেই ধরেছিল সকলে। আরও ১২ মিনিট পরে যখন তিনি টিটমাসের বলে এক রান করলেন (মাঝে আরও এক রান করেছিলেন) তখন যথেষ্ট আনন্দধ্বনি শুনলেন, কারণ তার দ্বারা মোট ৩ রান করে প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা (২) পেরোলেন।

তারপরেই সব ভুলে গেল লোকে। সুন্দরের আহ্বান সামনে—স্বীকার করো। পাতৌদি পারফিটের বলে অন্তত চার পা এগিয়ে মিড-অনে ড্রাইভ করলেন, তেমন মার, এই টেস্টে তখনও পর্যন্ত ইডেনে ঘটেনি। কোনও একটি মাত্র স্ট্রোক দীর্ঘসময়ের গ্লানির ও অভিযোগের জঞ্জালে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে—আমার পূর্ব অভিজ্ঞতায় ছিল না। সে আগুন দাউদাউ করে উঠল, যখন ওই ওভারের শেষ বলে মিড-অনে তুলে পাতৌদি বাউন্ডারি ঘটালেন।

টিটমাসের হাতের বল এইকালে বিষাক্ত। পরিমাপে স্থির, পেষণে নিষ্ঠুর ও দংশনে জ্বালাময়। মঞ্জরেকর আউট হওয়ার পরে বোরদে এসে স্লিক-বাউন্ডারির সাহায্যে রান শুরু করেছিলেন। অল্পসময়ের মধ্যে টিটমাসের আচরণে উত্ত্যক্ত হয়ে লেগে পুল করতে গেলেন, আর আউট হলেন বিচিত্র দুর্ভাগ্যে। শর্ট-স্কোয়ারে ফিল্ডিং করছিলেন মাইক স্মিথ। বোরদের প্রচণ্ড মার থেকে প্রাণ বাঁচাতে পিঠ ফেরালেন—বল পিঠে প্রতিহত হয়ে পার্কাসের কাছে গেল, তিনি ধরে নিলেন ও বোরদেকে পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে হল। বোরদের জায়গায় এলেন দুরানী। উইলসনও এলেন বোলাররূপে। উইলসনের বল দেওয়ার ভঙ্গি নিয়ে কিছু কৌতুকরসের সৃষ্টি হল। বল দেওয়া শেষ করেই তিনি হাতের চেটো উল্টে দেন, তাতে 'কি একটা হলো না, অথচ হওয়া উচিত ছিল' ভাব ফুটে ওঠে—ঘোষণা করলেন মাস্টার ঝন্টু, আমার পার্শ্ববর্তী দ্বাদশ 'বর্ষীয়ান' সুবিজ্ঞ বালক।

পাতৌদি এবং দুরানী একত্র খেলছিলেন। দু'জনেই এখন আকর্ষণীয় ভাবে প্রাণবন্ত। বারটা আটচল্লিশে পারফিটের বলে দুরানীর রকেট-সিক্সার বেরিয়ে গেল। তার ঠিক আগেই পাতৌদি পারফিটের বলে প্রহার করেছিলেন, সে বলের গতি এতই তীব্র ছিল যে, সম্পূর্ণ গতিরেখা অনুসরণ করা পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

বারোটার সময়ে, যখন ভারতের রান ৫—২৫৩, তখন মাইক স্মিথ নতুন বল নিলেন, এবং প্রাইসের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলটি পাতৌদির ইচ্ছায় এক্সট্রাকভাবে মাঠ চিরে বেরিয়ে গেল মাঠের বাইরে। পরের বলে মধুরতম স্পর্শে ও ছন্দে ডিপ ফাইন লেগে প্লান্সে বাউন্ডারি; এবং একটি বল বাদ দিয়ে পঞ্চম বলে লেট-কাট করে পাতৌদি হয়তো এক রান পেলেন, কিন্তু দর্শক পেল অনেক বেশি—সুষমার সাহিত্য।

পাতৌদি এখানেই থামলেন না। অতঃপর হাই কোর্টের দিক থেকে লার্টারের তৃতীয় বলে পা মুড়ে যে মারটি দিলেন, তা অনিবার্যভাবে উকিস-স্মৃতি বয়ে আনল, এবং তারপরে লার্টারের

পরবর্তী ওভারের ওই তৃতীয় বলেই একই চেষ্টায় যখন কট হলেন, তখন তাঁর রান মাত্র একত্রিশ, কিন্তু দর্শকের মতে, রানে কি এসে যায়! একত্রিশ রানের বিদ্যুন্ময় পাতৌদি তখন জনতার প্রাণপুরুষ।

—কত রান করল দেশের ক্যাপ্টেন। মাত্র একুত্তিরিশ। তাই নিয়ে এত কাব্য!

—কী জানো, আমাদের ক্রিকেট তখন ছিল স্বল্পবিত্ত। নিম্নবিত্ত। কিন্তু তার কোনও মহিমাকীর্তন করছি না। এখনকার সৌরভ-শচীন-দ্রাবিড় বা শেহবাগ তখন কল্পনার বাইরে। ওই যে মতি নন্দী বললেন না একটা কেকের মতো মাঠটাকে চারভাগে কেটে দেওয়া—ওয়াদেকর ওই ইনিংসে কত রান করেছিলেন জানো? চুয়াল্লিশ। বোরদের যে এক ওভারে চারটে চার, তাতে কত করেছিলেন বোরদে, তার আট বছর আগে? একুশ। পতৌদির যে একত্রিশ-এর কথা বললাম, তারও সাত বছর পর সিরিজে চারটি সেঞ্চুরি নিয়ে এসে পড়বেন সুনীল গাভাসকার। তারও বছর দেড়েক আগে আসবেন বিশ্বনাথ। কিন্তু যখন কিছু ছিল না, তখন তো দুঃখের ভাত সুখ করে খেত বাংলার ক্রিকেটপ্রেমী। গরিবের ঘরেও কি চাঁদের আলো পড়ে না? সেই জ্যোৎস্নালোক বড় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতেন শঙ্করীপ্রসাদ। একটি কিশোর প্রথম সাহিত্য রচনার কথা ভাবে শঙ্করীপ্রসাদের লেখা পড়ে। (মনে রাখতে হবে, মতি নন্দীর পথিকৃৎপ্রতিম খেলার উপন্যাসগুলো রচিত হতে থাকবে এরও এক দশকের বেশি সময়ের পর থেকে। এবং তারা চিরস্থায়িত্ব পাবে।) শঙ্করীপ্রসাদের একটি অসামান্য লেখার এক পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছিল এই বাক্যটি দিয়ে : ক্রিকেটের একজন কবির নাম ফ্রাঙ্কি ওরেল।

একটি পরিচ্ছেদ শেষ হওয়ার মানে যে একটি প্রয়োজনীয় বিরতি প্রক্ষেপণ—অর্থের দিক দিয়েও, পাঠকের শ্বাস ফেলার দিক দিয়েও—তা না-বুঝেও সেই বালক-বয়সে তা-ই যেন বুঝেছিলাম। ওই লাইন পড়ার পর, পরবর্তী পরিচ্ছেদ শুরু না করে বসেছিলাম খোলা বই কোলে নিয়ে। তখন ভারত কেমন খেলত? '৬৬-'৬৭-তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ২-০ হারল তৃতীয় টেস্টের হোম সিরিজে। গেল ইংল্যান্ড, ৩-০ হার। সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়া। '৬৭-'৬৮-র সেই সিরিজ ৪-০ হার। অর্থাৎ দশটা টেস্টে ন'টা হার। আমাদের ক্যাপ্টেন পতৌদি, তবু তিনি কিন্তু আমাদের নায়ক-ই তখন। এ-বিষয়ে কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দিশি গান বিলিতি খেলা' বইতে পতৌদির '৬৭-র ইংল্যান্ডে করা ৬৪ ও ১৪৮ রানের দু'টি ইনিংসে বর্ণনার পর যথার্থই লিখেছিলেন : 'বহু ম্যাচে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে একা কুম্ভ পাতৌদি সত্তর আশি বহুবার করেছেন এবং পরিস্থিতির মোকাবিলায় সেগুলো সেঞ্চুরির সমান সমান-ই।' কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই বইটি পড়েও অসামান্য সুখ। কিন্তু এ বই বেরিয়েছে ২০০২-তে, তখন আমার বয়স ৪৮, আর ভারতীয় ক্রিকেটে শচীন-সৌরভ যুগ এসে গিয়েছে। ওদিকে আমরা শঙ্করীপ্রসাদকে পেয়েছি ১৩-১৪ বছর বয়সে, সৌভাগ্যবশত ক্রীড়া-লেখক হিসেবে মতি নন্দীর অসামান্য উপন্যাসগুলোর একের-পর-এক আবির্ভাব আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদ ছিলেন আমার উন্মেষ।

—তা হলে স্বীকার করো, তুমি ক্রিকেটটাকে ক্রিকেট হিসেবে কোনওদিনও দ্যাখোনি। পড়ার একটা বিষয় হিসেবে দেখেছ?

—এটা হয়তো সত্যি! ধরো, ওইসময়ে এমন সব বই পড়েছিলাম যাদের সব লেখকের নাম মনে নেই—যেমন 'ব্রেবোর্ন থেকে ইডেনে' একটা বইয়ের নাম। লেখক, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় কি? তার পাতায় পাতায় খেলোয়াড়দের ছবি। এ যুগের মতো অমন ছাপা আসেনি, তবু কী সুন্দর লাগত! আরেকটি বই, খুব মনে আছে, 'উইকেট থেকে বাউন্ডারি', লেখক সম্ভবত দিলীপ দত্ত। ছোট্ট ছোট্ট দু-পাতা, দেড়পাতার ক্রিকেট গল্প। তার সঙ্গে ছোট একটা ছবি। রানাঘাট থেকে কলকাতায় এসে, বাড়ি বদলে বাড়ি বদলে, বইগুলো কিছু নেই আর। একালে 'উইকেট থেকে বাউন্ডারি'-র পাশাপাশি রাখা যায়, এমন সুন্দর দু'টি বই লিখেছেন অলক চট্টোপাধ্যায়। তাতেও ক্রিকেট গল্পের আনন্দ ভরা। নানা ধরনের ক্রিকেট গল্পের মধ্যে একটা খেলার স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু শুধু সেইটুকুই নয়, পাওয়া যায় এক-এক রকমের জীবনকেও। যেমন শঙ্করীপ্রসাদের লেখা থেকে একটি গল্প বলি, অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার ক্লারি গ্রিমেট। এই স্পিনার সম্পর্কে ব্যাডম্যান একসময় বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সেরা' স্পিনার।

ব্র্যাডম্যান-এর আগের ক্যাপ্টেন উডফুল বলেছিলেন : 'যদি ব্র্যাডম্যান বসে যায়, আমরা সকলে মিলে একটা ভদ্রগোছের রান দাঁড় করাতে পারব কিন্তু গ্রিমেট না থাকলে—দলের সব আশাভরসায় দাঁড়ি।' এই গ্রিমেট সম্পর্কে শঙ্করীপ্রসাদ লিখেছেন, গ্রিমেট পৃথিবীর ক্রিকেট অবহেলিত সর্বোচ্চ প্রতিভা। শৈশবে পিতৃহীন বালকের মতো তার বরাতে অবজ্ঞা জুটেছে শুধু। মনে রাখতে হবে, 'পৃথিবীর সেরা স্পিনার' বলা হয়েছে তিনের দশকে, আর শঙ্করীপ্রসাদ এই লেখাটি লিখছেন '৬৫ বা '৬৬-তে, 'নট আউট' বইতে যা আছে—তখনকার খেলার পৃথিবী ও স্পিনারদের নিয়েই এই বিচার। পরবর্তীকালে খেলার মানের যে বদল ও উন্নতি ঘটবে তখনও তা কল্পনার অতীত। একেবারে যুগেরই বদল সেটা।

এই গ্রিমেটের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন স্বয়ং ব্র্যাডম্যান। কী কাণ্ড! যে ব্র্যাডম্যানের বিরোধী, বা ব্র্যাডম্যান যাঁর প্রতি অপ্রসন্ন, তার আর ভবিষ্যত কী? একটা প্রমাণ, '৩৮ সালের ইংল্যান্ড সফরে গ্রিমেট বাদ পড়লেন।

শঙ্করীপ্রসাদ লিখছেন, 'লোকে বলে ব্রিটিশ ক্রিকেটাররা নাকি দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছিল বাদ দেওয়ার মূল মালিক ব্র্যাডম্যানকে। তারপর সেই হাত নামিয়ে যখন তারা ব্যাট ধরল, একা বিল ওরিলির সাধ্য হয়নি ওভালে ইংল্যান্ডের সাত উইকেটের ৯০৩ রান আটকাতে।' এই সেই ইনিংস কিন্তু, যেখানে লেন হাটন তাঁর ৩৬৪-র বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। সেই বাদ পড়া গ্রিমেট পরের মরশুমে ৪৭ বছর বয়সে, অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে নতুন রেকর্ড করলেন। এক অস্ট্রেলিয়ান সিজনে সর্বাধিক সংখ্যক উইকেট (ন'টি ম্যাচে ৭৩টি) সংগ্রহ করে। টেস্ট দলে আর ফিরতে পারেননি ক্লারি গ্রিমেট, যদিও ২১৬টি টেস্ট উইকেট মাত্র পাঁচ-ছ'বছরের টেস্ট কেরিয়ারে তিনি দখল করেছিলেন। কারণ ব্র্যাডম্যান তখন সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। ব্র্যাডম্যান কারও বিরুদ্ধে গেলে, কেউই তাকে দলে নিতে সাহস পাবে না।

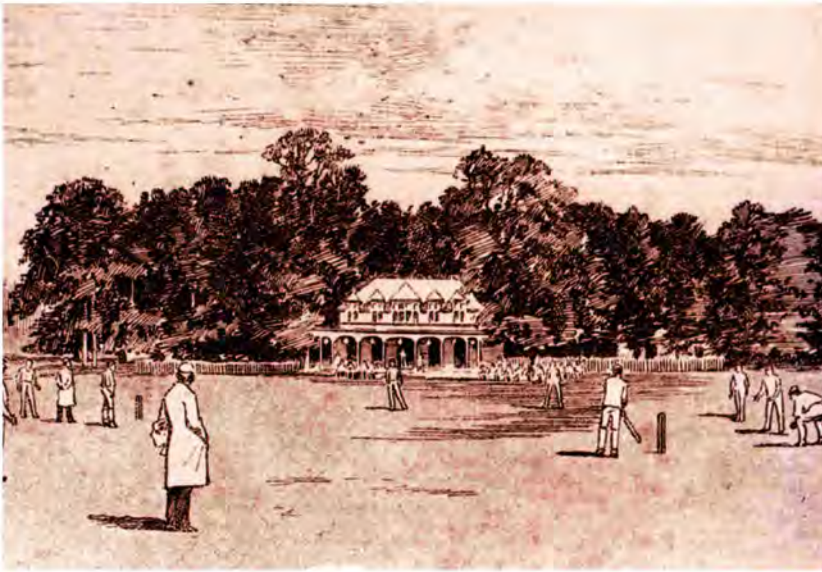
এই গ্রিমেটের টেস্টিমোনিয়াল ম্যাচের কথা লিখেছেন শঙ্করীপ্রসাদ। ম্যাচের টাকা গ্রিমেট পাবেন। ব্র্যাডম্যান, আচ্ছা, থাকগে, বেনিফিট ম্যাচ বলে কথা—এই সব ভেবেই হয়তো দয়া করে রাজি হলেন সেই ম্যাচে খেলতে। আর ব্র্যাডম্যান যখন অংশ নিচ্ছেন খেলার সাফল্য অবধারিত।

'ব্র্যাডম্যান ব্যাট করতে নামলেন। পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান। তাঁর বিরুদ্ধে বল হাতে নিলেন গ্রিমেট। পৃথিবীর সেরা স্লো-লেগব্রেক বোলার। কিন্তু এখনও পৃথিবীর সেরা আছেন কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ জেগেছে অনেকের মনে, বিশেষত ব্র্যাডম্যানের। তাঁর ধারণা, গ্রিমেট আর যথেষ্ট বল ঘোরাতে পারছেন না। ডনের এই ধারণার জন্য গ্রিমেটের ইংলন্ড যাওয়া হয়নি এবার।

এই লোকটিই শনি। এর জন্যই আমার ইংলন্ড যাওয়া হয়নি। গ্রিমেট তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও প্রতিজ্ঞাকে বিস্তারিত করে যে-বল ছুড়লেন, তা অদ্ভুত ব্রেক করে ব্র্যাডম্যানকে আউট করে দিল অচিরে।

ব্র্যাডম্যান ফিরে যাচ্ছেন, গ্রিমেট আনন্দে উচ্ছ্বসিত। গালভরা হাসি নিয়ে অন্য ব্যাটসম্যানকে বললেন—'দেখ হে, ডন বলে, আমি নাকি বল ঘোরাতে পারি না—এখন কি হলো।'

অন্য ব্যাটসম্যান গম্ভীর হয়ে বললেন—'তা ঠিক, তুমি বল এবং



ভাগ্য দুইই ঘোরাতে পেরেছ যথেষ্টভাবে...'

'বলছ তো, ঠিক বলছ!' —গ্রিমেট খুশিতে হাসিতে প্রায় ভেঙে পড়েন।

'মূর্খ!'—অপর ব্যাটসম্যানের কণ্ঠ এখন তীব্র ও শাণিত—'তোমার ওই অপূর্ব বলটি তোমার পকেটের কুড়ি হাজার টাকা হালকা করে দিল—ডন আউট হয়ে গিয়েছে শুনলে দুপুরে আর কেউ মাঠে ঢুকবে না।'

এই আশ্চর্য গল্পটি পরবর্তী জীবনেও আমার মনের মধ্যে থেকেছে। শিল্পীর কাছে তার শিল্পসাধনাই সব। কত নিখুঁতভাবে সে সেটা করতে পারছে। তার জন্য বৈষয়িক লাভের কথা তার মনে থাকে না। ওই বলটি ডেলিভারি করার যে আনন্দ, তা শিল্পীর উল্লাস।

এইরকম খেলার মধ্যে শিল্পজীবন খুঁজে এনেছেন শঙ্করীপ্রসাদ, দেশবিদেশে ক্রিকেট-সাহিত্য থেকে আহরণ করে কখনও। কখনও নিজ অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা। নেভিল কার্ডাস থেকে শুরু করে জ্যাক ফিঙ্গলটন, রে রবিনসন—আরও কত জানা-অজানা লেখকের স্বাদ তিনি দিয়েছেন আমাদের। অন্যদিকে তাঁর লেখা 'লাল বল লারউড' তেমনই একটি বই, যা লারউডস স্টোরি-র ভাবানুবাদ হলেও, ভাষায় ও ব্যক্তিত্বে শঙ্করীপ্রসাদেরই সৃষ্টি। এই বইটি আমি যতদিন বাঁচব ততদিন আমার ভেতরে বেঁচে থাকবে। কী সুন্দর সব নাম ছিল শঙ্করীপ্রসাদের বইগুলোর। 'বল পড়ে, ব্যাট নড়ে', 'ইডেনে শীতের দুপুর', 'ক্রিকেট, সুন্দর ক্রিকেট'। প্রথম পড়েছিলাম, 'নটআউট'।

—আর আজকের লেখা কিছু পড়ো না!

—পড়ি তো। এখনকার ক্রিকেট-লেখকদের মধ্যে গৌতম ভট্টাচার্যের খ্যাতিই সর্বাধিক। এবং যোগ্যতাও। তাঁর বইগুলি তো আছেই আমার কাছে। সব্যসাচী সরকার ও দেবাশিস দত্তের বইগুলিও আছে। সব্যসাচী একটি উপন্যাসও লিখেছেন, সেটিও আছে আমার। অশোক দাশগুপ্তের লেখা উপন্যাসও আছে।

—এঁদের লেখায় কি বদলে যাওয়া সময়ের ক্রিকেট তার আগুন আর আক্রমণাত্মক ঝলক নিয়ে উপস্থিত নয়?

—সগৌরবেই উপস্থিত। কিন্তু দিন যত যায়, ততই যেমন মনে আসে বাল্যকাল ছোঁয়া দিনগুলি, মনে আসে কৈশোরের ঋতুবদলের আলোআঁধার—তেমনই মনে পড়ে ওইসব বইয়ের কথা। লারউড বা গিলক্রিস্ট-কে নিয়ে শঙ্করীপ্রসাদের লেখা, যার মধ্যে এই দুই ফার্স্ট বোলারের অগ্নিময় চরিত্র ও ট্র্যাজিক পরিণতি এক অসামান্য দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে। অথবা সিড বার্নসকে নিয়ে লেখা, জে এল জেসপ-কে নিয়ে লেখা...এগুলিরই কি তুলনা হয়?

—জে এল জেসপ? সে আবার কে?

—শেওয়াগের খেলা টিভিতে দেখে মনে হয় শঙ্করীপ্রসাদের জে এল জেসপকে নিয়ে লেখার কথা। ছক্কা মারায় সিদ্ধহস্ত যিনি। এমনকী 'পি চৌধুরীর শেষ খেলা' লেখাটাও কি ভুলতে পারব কখনও?

—কী শুরু করেছ? সিড বার্নস, জে এল জেসপ, আবার পি চৌধুরী? এরা কে এবং কোথায়? এখন? তোমার ওই টিটমাস, পারফিট, মাইক স্মিথের মতো এরা সব হারিয়ে গিয়েছে! এদের এখন কোথায় পাবে!

—ঠিকই, কোথাও পাব না। শঙ্করীপ্রসাদের ওই বইগুলিতেই ছিল এইরকম সব স্বপ্নের ক্রিকেট-চরিত্র।

—তা হলে বইগুলি খোলো। তা হলেই পাবে!

—না। পাব না। ওই বইগুলিও হারিয়ে গিয়েছে।

—হারিয়ে গিয়েছে? মানে?

—মানে হল, ইচ্ছে করলেই তুমি আর কোথাও 'লাল বল লারউড' পাবে না, কোনও দোকানে। 'ইডেনে শীতের দুপুর' পাবে না। ওরাও দোকান থেকে হারিয়ে গিয়েছে। আর ছাপা হয় না এখন। দু-খণ্ডে ক্রিকেট অমনিবাস বেরিয়েছিল। কিনেছিলাম। বাড়ি বদলের সঙ্গে হারিয়ে গেল খণ্ড দু'টো।

—অত নিরাশ হ'য়ো না, 'বাছাই ক্রিকেট' নামে একটা বই এখনও পাওয়া যায়। সব বই থেকে টুকরো-টুকরো লেখা একটু করে তুলে দেওয়া আছে সেখানে। নেবে? আছে আমার।

—নিশ্চয়ই নেব। দাও তো শিগগির। বাঃ খুব ভাল হল! ক্রিকেট নিয়ে একটা লেখার বরাত পেয়েছি। তোমার এই বইটা নিয়েই তা হলে এবারের মতো আমার পড়ার খেলা আর খেলার পড়া শুরু করে দিই!

ক্রিকেট ▲ শম্পালী মৌলিক

ঘাসের জাজিম মেঘের ঘোড়া

দোকানি বলল, 'বেশি দামি ব্যাট কিনে কী হবে, মেয়ে তো, বেশিদিন খেলবে না।' স্টান্স নিতেই ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ থেকে আওয়াজ উঠল, 'নে রে কোলে নে, কুঁড়ি রে!'

সেই তো প্রথম নয়। আগে ও পরেও বহুবার ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকা একলা রাতে তাকিয়ে থেকেছি মাঠের দিকে। রাতের শিশির ঝরে যায় কাঁটাতারে ঘেরা আয়ত সে-জমিতে। ভারী বাষ্পের মতো সাদা কুয়াশা বসে যায়। নিঃশব্দে। একস্তরের ওপর আরেক স্তর। ভীষণ চেপে দেয় মাটির গভীরে। স্টাম্প্ড আউট হয়ে যাওয়া মানুষের পায়ের ছাপ। দেখা যায় মঞ্চের সেই গোল আলোটা আর নেই। ব্যাট তুলে দাঁড়ানোর মতো ধ্রুব হতে পারত যা। গোল করে পাকিয়ে রাখা স্মৃতির মাদুর খুলে যায়।

মেরে বলের সুতো খুলে দেব—কিন্তু সুতো কোথায়? খুলবেই বা কী করে! যখন খচা আম্পায়ারের উইকেটে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটা বল করার পর খচা এটা বলে। কিন্তু কেন? কই আমি তো বলি না ব্যাটের হ্যান্ডেল খুলে দেব। রাগ যে আমার যে হয় না তা তো নয়। এই পিচটায় আবার একপাশের উইকেটেই ব্যাটিং হয়। আমি বল হাতে হাঁটি। আর ও আনসান বকে।

ভাবনার তাল কেটে গেল। বলটা এসে লাগল। সরাসরি শিরদাঁড়ায়। একেবারে নীচের দিকে। কোমরের কাছটায়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য কোনও সাড় নেই। পিট্টু খেলছিলাম একদল। আমি আউট হওয়ামাত্রই টিফিন শেষের ওয়ার্নিং বেল পড়ে গেল। হুড়মুড় করে মাঠ ছেড়ে যে যার ক্লাসরুমের দিকে ছুটল। আমার হাতে তখনও পাঁচ মিনিট। ফাইনাল বেল তো পড়েনি।

বল কুড়িয়ে খেলাঘরের কাছে চলে গেলাম। এ এক আশ্চর্য খেলাঘর। বিরাট মাঠের একধার ঘেঁষে। ঘরের একদিকে দু'মানুষ সমান লম্বা পাঁচিল, বাকি তিনদিক খোলা। মাথায় উঁচু ছাদ। আর লম্বা লম্বা থাম ধরে রেখেছে তাকে। উত্তরদিকে প্রার্থনার মঞ্চ। আর অসম্ভব সুন্দর সাদা সিমেন্টের মেঝে। গতকাল উইকেট এঁকে রেখেছি। সামনে শান-বাঁধানো পিচ যেন। কোনও ব্যাটসম্যান নেই। হলুদ দেওয়ালে লাল ইট দিয়ে আঁকা তিন কাঠি।

আমি করতাম কী, রান আপ নিতাম মাঠের ঘন ঘাসে আর শেষ লাফটা দিতাম মেঝেতে পা রাখা মাত্রই। উইকেট তাক করে চলত আমার স্কুলফেরতা ম্যাচের প্রস্তুতি। জোরে, আরও জোরে। খুব ভাল ক্যাম্বিস বলও এক সপ্তাহও যেত না। কংক্রিটের দেওয়ালে ঘষে ছেঁচড়ে যেত ওর ওপরের সবুজ কিংবা লালচে তুলোট স্তর, দু'দিনের মধ্যেই। তারপর মোক্ষম ম্যাচের আগে ফেটে যেত। রবারের বল আরও কম টিকত। রোজ রোজ বল কেনার পয়সা কোথায়! মুদির দোকানে শীতকালে ক্রিকেট বলে ভর্তি এক নেটের ঝোলা ঝুলত। দোকান গেলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম সেদিকে। নিরুপায় লাগত। বল ফাটা মানে টিপ করে প্র্যাকটিস হবে না! ওভার শেষ হতে না হতেই টিফিনের ফাইনাল বেল পড়ে যেত। খেলাঘর, মাঠ পেরিয়ে মূল বিল্ডিং—অনেকটা পথ এবং দোতলায় আমার ক্লাস শুরু হয়ে যেত। প্রতিদিনই নিজের আগের রেকর্ড ভেঙে ছুটতাম কিন্তু ততক্ষণে হয়তো অপু ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। 'পথের পাঁচালী' পড়াতেন চিত্রাদিভাই। ফলে আমার ঢুকতে দেরি দেখে উনি একইসঙ্গে অবাক আর বিরক্ত হতেন। ওঁকে কী করে বোঝাই, ও-বই গোগ্রাসে গিলেছি গতরাতে। তার চেয়ে প্র্যাকটিসটা আট্টু করে নিলে হত না!

রিডিং পড়তে দিতেন হঠাৎ করে, তারপর ওই অংশের মধ্যিখান থেকে প্রশ্ন জিগ্যেস করতেন। আমি তখন ক্লাসের খোলা দরজা, লম্বা বারান্দা পেরিয়ে মাঠে। মনে মনে নেট প্র্যাকটিস করছি। নতুন দিভাইয়ের পিরিয়ডও ওই সময় পড়লে সরল মেলাতে পারতাম না। বাড়ি ফিরেই যে আট ওভারের ম্যাচ! নীল বাস উত্তরপাড়া-হিন্দমোটরের লম্বা রাস্তা পেরিয়ে কখন বাড়িতে নামাবে তার অপেক্ষায় না-থেকে আমি বাড়ির গলির কাছে বড় রাস্তায় নেমে পড়তাম। আরও অনেককে নামিয়ে তবে আমার বাড়ির টার্ন আসবে। তাই ফালতু সময় নষ্ট না-করে দৌড়ে বাড়ি আসতাম। মা তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। পাশের বাড়ি থেকে চাবি নিয়ে একটু খেয়েই কেড্স পরে ব্যাট নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। বাড়ির সামনেই খেলার মাঠ। সম্ভবত ক্লাস সিক্স-সেভেন হবে তখন। আটজন করে টিম হত। আমি খুব চাইতাম আগে ব্যাট



পেতে। শীতকাল, পরে আলো কমে যাবে। আর এক-একটা ছেলে যা জোরে বল ছুড়ত, জাস্ট বল দেখা যেত না। লটারি করে টিম হত, অনেক সময়। সোম থেকে শুক্রবার সবাই তো এক পাড়ারই। বেপাড়ার সঙ্গে খেলা হলে নিজেদের মধ্যে সেরা টিম বাছা হত। সেটা শনি-রবিবারে। রান, উইকেট ছাড়া ফাউ মিলত বাপুজি কেক, কলা, ডিমসেদ্ধ। কেন কে জানে, দলের ছেলেরা আমাকেই ক্যাপ্টেন করত। আগে ব্যাট পেলে ওপেন করতাম। ফেস করতাম আমি আর নন-স্ট্রাইকিং এন্ডে স্বপন। দু'তিনটে বল দেখে খেলেই বিগ হিট নিতাম। অফ সাইডের বল টেনে এনে মারার প্রবণতা ছিল আমার। মানে উইকেটের বাইরে যে বল চলে যাচ্ছে, ব্যাকফুটে গিয়ে গোটা শরীরের ওজনটা ডানপায়ে ট্রান্সফার করে, ঘুরিয়ে মারার মধ্যে খুব আনন্দ পেতাম। অনেক সময় হিট-উইকেট হয়েছি যে জন্য। কিন্তু শট-টা ঠিকঠাক হলে শিওর ছক্কা ছিল। নেশার মতো লাগত। স্বপন ওপেন-ও করত, আবার খুব ভাল বলও করত। রানের জন্য দৌড়তে গিয়ে ও-আর আমি কতবার যে মুখোমুখি ধাক্কা খেয়েছি তার হিসেব নেই।

মা খুব বকত যদি কারও মুখে শুনত আমি হেঁটে বাড়ি ফিরেছি। যদি গাড়ি চাপা পড়ে যাই, এই ভয় পেত। বকুনির ভয়ে মাঝে মাঝেই আমাকে বাড়ির দোরগোড়া অব্দি স্কুলবাসেই ফিরতে হত। এসে দেখতাম টিম হয়ে গেছে। আমি স্বপনকে বলে যেতাম—'আজ তুই ক্যাপ্টেন। আমি পাঁচ মিনিটে খেয়ে আসছি।' ফিল্ডিং পেলে প্রবলেম হত। আমাদের টিমে তখন একজন কম থাকত খানিকক্ষণ। সুযোগ নিত প্রতিপক্ষ। ভীষণ রাগ হত বাসওলার ওপর, কেন যে দেরি করে এত। দেরিতে মাঠে যাওয়া মানে পরে ব্যাট পাওয়া। সেই কবে আউট হবে একজন, তবে ব্যাটিং পাব। আর আগে ফিল্ডিং হলে বেশ খানিকক্ষণের জন্য স্লিপ-এ দাঁড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া, এবং কয়েক ওভারে ওরা প্রচুর রান তুলে নেবে। নিজেকে তখন ওয়াসিম আক্রম ভাবি। কোনাকুনি অ্যাঙ্গলে আমার মতো বল আর কে পারে! রিস্টব্যান্ডে আক্রমের কায়দায় ঘাম মুছি। যদিও হাতে তখন ক্যাম্বিস বল এবং ১১০ টাকা দামের নীলচে-সাদা রঙের কাঠের ব্যাট। গ্রিপটা দড়ির। যদি কখনও মা আগে আগে স্কুল থেকে ফিরে যেত, আমার জন্য প্রকাণ্ড ফলাহারের আয়োজন করত। টিফিনে যে সব আপেল-লেবুকে বল বানিয়েছিলাম, তারা তখন শোধ তুলত।

স্কুল থেকে ফিরে খাওয়ার জন্য এতটা সময় নষ্ট—আমার রাগে কান্না পেয়ে যেত। রোগা-পটকা আমি, খেতে মোটেই ইচ্ছে করত না। খাওয়া শেষ করে যখন মাঠে গেলাম ছ'ওভার হয়ে গেছে। মাঠের ধারে সাইকেলের পাশে বসে থাকতাম। আর বলটা নাচাতাম ব্যাটে। হয়তো স্বপন তখন চার-ছক্কায় জেতাচ্ছে। এরকমই একদিন পরীক্ষা দিয়ে মামাবাড়ি হয়ে ফেরার প্ল্যান কষল মা। শুনেই আমার অসহ্য লাগতে শুরু করল। তা হলে যে খেলা হবে না। যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষা দিলাম। মা স্কুলের বাইরে অপেক্ষা করছিল। নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগে বেরনোয় মা



বেশ ঘাবড়ে আছে বুঝলাম। উত্তরপাড়া থেকে কোন্নগর, বেশিক্ষণ লাগে না। তবে মামাবাড়ি হয়ে যখন বাড়ি ফিরছি প্রায় পাঁচটা বাজে। বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে। মাঠের পাশ দিয়ে রিকশা করে এসে তবে আমাদের বাড়ি ছিল। রিকশা মাঠের বর্ডার ছোঁয়ামাত্র এক লাফ দিলাম। রাস্তার ধারে স্টোনচিপ্‌স ফেলা ছিল। একটা স্কুটার আসছিল। ঝাঁপ দিতে গিয়ে চলন্ত রিকশা থেকে পড়লাম। স্কুটার দেখে হয়তো নার্ভ নড়ে গিয়েছিল। এর আগে বহুবার স্কুলফেরতা চলন্ত ভ্যানরিকশা থেকে নেমেছি-উঠেছি, কিছুই হয়নি। ফলে পড়ে ব্যথা পাওয়ারও আগে অবাক হলাম! বাব্বাবা, এ কেমন রিকশা? স্কুলের টিউনিক পরে থাকায় দু'টো হাঁটুতেই কুচো পাথর ঢুকে গেল। প্রথমে পা-দু'টো কী ঠান্ডা আর গোলাপি সাদা, তারপর রক্ত...। ভেবেছিলাম রিকশা পৌঁছবার আগেই আমি বাড়ি পৌঁছব, যদি এক ওভারও ব্যাট করতে দেয়, তার বদলে পৌঁছে গেলাম নার্সিংহোমে!

মা তখন দিনে-রাতে ক্রিকেট ব্যাটটার শাপশাপান্ত করে। কী কুক্ষণেই না কিনে দিয়েছিল, 'খেলাঘর' নামের একটা ছোট দোকান থেকে। ওখানে নাকি ব্যাট, প্যাড, গ্লাভস, টুপি, জার্সি, গার্ড হেলমেট, কর্কেট, ডিউস—সব ছিল। কিন্তু বেশি লম্বা হইনি বলে ওই ব্যাটটা দিয়েছিল লোকটা। বলেছিল—'বেশি দামি কিনে কী হবে? মেয়ে তো, বেশিদিন খেলবে না। এইটাই নিন দিদি। বছর তিনেক হেসে-খেলে। কত জোরে আর হিট করবে? ফেটে গেলে অন্য কোম্পানি পরে কিনে দেবেন। আর টেপ নিয়ে নিন, চিড় খেলে লাগবে। স্কিপিং দেব একটা?'

আমার একটুও ইচ্ছে করেনি ওই দোকানটা থেকে কিনতে। কিন্তু পরে মা-র মত বদলে যায় পাছে...। লোকটা তো জানেই না নারকোল পাতার শিরদাঁড়া দিয়েও ভাল ব্যাট বানানো যায়। সরু দিকটা কাটারি দিয়ে চেঁছে হ্যান্ডেলের মতো করে নিলেই হল। আর চওড়া দিকটা হল ব্যাটের বুক। টেনিস বল, রবারের বল ওই ব্যাটে খেলে ততদিনে আমি ফাটিয়ে দিয়েছি। শুধু গ্রিপ করতে হাতে লাগত, চোঁচ ঢুকে যেত প্রায়ই। আমার ব্যাটিং-এ পাড়ার কোনও বোলার দু-হাওয়াই-এর মাঝখানে বল গলাতেই পারেনি। স্বেচ্ছায় রিটায়ার নিয়ে অন্যকে আমার কোকো-ব্যাট দিয়েছি। পরে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যখন কোকাবুরা বল এল, ভেবেছি আমার আমার সেই ব্যাটেরই আত্মীয় বুঝি!

প্লাস্টিকের ব্যাট-উইকেট-এ বেশিদিন খেলিনি। দিদা রেডিও-তে ক্রিকেট কমেন্ট্রি শুনত আর আমি পাশে ঘুমোতাম। হয়তো তখন গাভাসকার খেলতেন। কপিল দেব, শাস্ত্রী, রজার বিনি, বেঙ্গসরকর, সন্দীপ পাতিলরাও ছিলেন। আমি বিশেষ কিছু বুঝতাম না। প্রথম ব্যাট-বল খেলা দিদার সঙ্গেই। মামণি-ই আমার প্রথম ক্রিকেট খেলার সাথী। বিরাট বড় বড় ঘর ছিল মামাবাড়িতে। লাল মেঝে তার। পিংপং বল টকটক করে ড্রপ খেত। কী জলদি মাথার ওপরে উঠে যেত। আমি ভাল পারতাম না সামলাতে। সবই হয়তো মার্শালের বাউন্সার-এর মতো লাগত। আঙুলের মাথায় বলটা সজোরে খেলে নখে খুব লাগত। একদিন ব্যাট ধরা শিখে গেলাম। খাটে বসে মামণি বল দিত। ইন্ডোর ক্রিকেট। কাপ-প্লেট, ফুলদানি, ঘড়ি ভাঙছে—একটা-দু'টো। নাহ্‌, এবার তবে আউটডোর।

ঘাসে মোড়া দালানে খেলা শুরু। ততদিনে মামাবাড়িতে এসে গেছে সাদা-কালো 'টেলিভিস্তা'। কপিল দেব, চেতন শর্মা, মিঁয়াদাদ, রামিজ রাজা, আবদুল কাদির, ওয়াকার ইউনিস, রমন লাম্বা নাম শুনেছি মাত্র। আর হ্যাঁ, পোস্টকার্ডের ছবি জমাতে শিখে ফেলেছি। এবং আমার ছিল ইমরান খানের খালি গায়ে একটি পিকচার পোস্টকার্ড। নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে হত ওটাকে। দিদার শেষ ইচ্ছে ছিল আমার যেন ইমরানের মতো বর হয়! শাটার টানা টিভি ছিল বলে গোলা বল খেয়েও বেঁচে গেছে টিভি সেট বহুবার। আমি বাঁচলাম না। একবার মাথায় বড়দের ডিউস খেয়ে তিনটে স্টিচ নিয়ে ফিরলাম। আর চুল গজায়নি ওখানে। ক্লাস সিক্স-এ মামণি-র মৃত্যুর পর ইমরান আমার কাছে প্রিয় ঠিকই। কিন্তু তার পরেই শচীন এসে গেল। আজহার, শাস্ত্রী, বেঙ্গসরকর-এর পর তখন সঞ্জয় মঞ্জরেকর, শচীন, দ্রাবিড়, সৌরভের দিন শুরু। শচীন আসার পর কাউকে নিয়ে ভাবার সময় পাইনি। কিন্তু বল হাতে ওয়াসিম-ইমরান হতে চেয়েছি চিরকাল। কেউ জানত না, শর্ট-এ ফিল্ডিং করতে ভয় পেতাম। মনে মনে রমন লাম্বা-র মৃত্যুটা আসত।

কোকো-ব্যাটে খেলতে খেলতে আমার ক্রিকেটার হওয়া। মায়ের দেওয়া ব্যাট-টা ভীমের গদার চেয়েও শক্তিশালী ভেবেছি চিরটাকাল। পরে আরও দামি ব্যাটও পেয়েছি। ডিউস-কর্কেটের সাড়ে পাঁচশোওলা ব্যাট! মায়ের কোল্ডক্রিম দিয়ে পুঁছে ব্যাটের দফারফা করে ফেলেছিলাম। ব্যাটের হ্যান্ডেল দিয়ে ঠুকে ঠুকে উইকেট পুঁতে ঠিক করা, বেল লাগানো, জমিতে দাগ কেটে উইকেট গার্ড নেওয়া, তারপর একটু এগিয়ে পিচটা সামান্য ঠুকে দেখার মধ্যে যে দর্প আছে, তার সঙ্গে বোধহয় কোনও কিছুর তুলনা চলে না। আমার পূর্ববর্তী ব্যাটসম্যান চলে গেছে, আমি তো আছি, এবার খেলব—নে আয় বল দে। এটা চূড়ান্ত মাত্রা ছোঁয় যখন বোলার বলটা প্রায় হাফ পিচ টেনে এনে খেলায়। মানে ব্যাটসম্যান ফ্রন্টফুটে খেলল, পা বেশ স্ট্রেচ করে। ডান পা একটু উঠল কী, উইকেটকিপার বেল উড়িয়ে দিল। অথচ মাথা একটু ঝুঁকিয়ে আম্পায়ার নট আউট দিল। তখন পুরো গর্বটাই ক্রিজ আঁকড়ে থাকা মানুষটার। এটা খুব হত আমার, যখন ওয়ান ডাউন-এ নামতাম। তারপর ক্রিজ ছেড়ে একটা দু'টো শট নেওয়ার পর বোলার চেষ্টা করত অপোনেন্ট। প্রচুর আওয়াজ খেত ছেলেটি। ফাস্ট বোলার চলে আসত দ্রুত। এবং সব শরীর লক্ষ্য করে। কনুই ভাঙা, সোজা—এসব নিয়ম তো পাড়া ক্রিকেট হয় না। সব বলই খেলতে হবে। একবার অমন জোরে বলে আমি নামার পরে ফরোয়ার্ড শর্ট লেগ-এ একজন বসিয়ে দেওয়া হল। চতুর্দিকে আওয়াজ—'নে রে কোলে নে, কুঁড়ি রে।' এক ওভারের পরেই ছেলেটা সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেদিন সিক্সটি করেছিলাম।

যেদিন বড় মাঠে বড়দের খেলা থাকত, আমরা ছোটরা পাড়ার গলিতে খেলতাম। ইটের পরে ইট সাজিয়ে উইকেট বানাতাম। রান ঠিক করাই থাকত—যেমন লেগ-এর দিকের পাঁচিলে লাগলে চার। কোনও স্লিপ থাকত না, শুধু উইকেটকিপার। অফ-এর দিকের বাড়ির দেওয়াল চার। বোলারের মাথার ওপর দিয়ে লং-এ রাস্তা টপকে মারতে পারলে ছয়। আর মাটি ছোঁয়া স্ট্রেট ড্রাইভ-এ কিছুই হবে না, কারণ সরু গলি, বোলারই বল আটকে দিচ্ছে। তবে বল হারিয়ে গেলে কিন্তু আউট। খুঁজে আনতে হবে ব্যাট-করনেওলাকেই! আর মাঝে-মাঝেই 'চোট্টা' 'চোট্টা' আওয়াজে ছত্রখান হবে নিস্তব্ধ দুপুর।

গলিতে আমার মিডিয়াম পেস কাজে লাগত খুব, কারণ ক্যাচ উঠত সহজে। ক্যাম্বিস বলও অকারণ প্যান্টে ঘষতাম কেন কে জানে! পালিশ তোলার বলই তো নয়। ব্যাট করার সময়ে চার-ছক্কার টানে জোরে মেরে ফেলতাম। বল হারিয়ে যেত। ড্রেনে পড়ে যেত। ছুটে যেতাম পাঁইপাঁই করে। উপুড় হয়ে পড়তাম খোলা ড্রেনের ওপর। বলের ড্রপ খাওয়া স্বভাবের জন্য পাঁকে পড়ে আবার ওপরে উঠবে, এই আশায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। ড্রেনের কালো জল বুড়বুড়ি কাটত। বুঝে যেতাম—এই তবে গুড লেংথ স্পট। খপ করে হাত ডুবিয়ে দিতাম। কখনও-সখনও পেয়েও যেতাম! তারপর জোরে ড্রপ খাইয়ে বলের ভেজা গা থেকে পাঁক ছাড়িয়ে রাস্তার কলে ধুয়ে নিতাম। ভারী বল ব্যাটে লাগামাত্র ধপ করে শব্দ হত আর গোল-গোল কাদা দাগে ব্যাট ভরে যেত। একটু বাদেই বল শুকনো। একবার লোভ সামলাতে না পেরে গদাম করে চালিয়ে দিলাম, ফুলটস ছিল। মেরেই বুঝলাম বল হারিয়ে যাবে। এই রে, ফিরে তো আর ব্যাটিং পাব না—নে দৌড় দৌড়। দুপুরবেলা পাড়া ঘুমোচ্ছে। দূরে টালির ছাদে বলটা পড়েছে বুঝলাম, কিন্তু কোথায়? সে বাড়ির সদর দরজাটা ভেজানো ছিল হয়তো।



ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারতেই খুলে গেল। সেই প্রথম দেখলাম দু'টো মানুষের মিলনদৃশ্য।

পা-টা মাটিতে আটকে গেছে মনে হল। লোহার জলের বালতির পাশে বলটা গড়াচ্ছে। তুলে নিয়েই রুদ্ধশ্বাসে ছুটলাম। কী একটা ঘটেছে বুঝতে পারছি। ব্যাট আমার, ছয়ও আমার, তবু যেন ভয় লাগছে ব্যাট করতে যেতে। এক দাদা কাছে এল, জিগ্যেস করল, কী হয়েছে? কিছু না, বললাম। পরের বলেই মিডলস্টাম্প উড়ে গেল আমার।

ভিভ রিচার্ডস মাইক গ্যাটিং গ্রাহাম গুচ গ্রেম হিক রিচি রিচার্ডসন ডেসমন্ড হেনস অরবিন্দ ডি'সিলভা মুরলীধরণ চামিণ্ডা ভাস হ্যান্সি ক্রোনিয়ে ডোনাল্ড জন্টি রোডস কোর্টনি ওয়ালশ ব্রায়ান লারা কালিস দেবতা আমার কাছে। মহাকাব্যের হিরোদের থেকে এঁদের বেশি ভক্তি করি ক্রিকেটের সেই দিনগুলোতে। অনেকেরই খেলা দেখিনি। কিন্তু 'স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড'-এর বহু পুরনো সংখ্যা, আনন্দমেলার পোস্টার, পেপার কাটিং-এর মোটা মোটা খাতা জমাই। আঠা জোড়া আঙুল, কালি-মাখা নখ এবং এক-একজন দেবতার ঠিকুজি-কোষ্ঠী তৈরি আমার জীবনের অনেকটা সময় নিয়েছিল। গাস লোগি বলে একজন প্লেয়ার ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল লোকটা গলি ক্রিকেট খেলে এত বড় হয়েছে। এবং সে বেশিরভাগ সময় গালি-তে ফিল্ডিং করত। বাংলার রঞ্জি ম্যাচ দেখার জন্যও বায়না করতাম একসময়। ছোটমামার সৌজন্যে পৌঁছেছিলাম ইডেনে এক শীতের সকালে। সরু গোঁফওলা সৌরভ গাঙ্গুলিকে প্রচণ্ড হ্যান্ডসাম লেগেছিল। পরে অবশ্য লক্ষ্মীরতনকেও। ঈষৎ অনামী ইন্ডিয়া প্লেয়ার হৃষিকেশ কানিতকর, সলিল আঙ্কোলা-কে দেখতে খুব ভাল্লাগ্তো। নরেন্দ্র হিরওয়ানি, রাজু কুলকার্নি—এদের স্পিন দেখতাম কিন্তু মুগ্ধ করেনি কখনও। বরঞ্চ ইয়ান বথাম টানত আমাকে।

তবে স্পিনার মানে শেন ওয়ার্ন। তার ওপর যে লোকটা শচীনকে দরাজ সার্টিফিকেট দেয়, তাকে ভাল না বেসে আমার উপায় ছিল না। পছন্দ ছিল ভেত্তোরি, মুরলীকেও। শ্রীনাথ, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, রবিন সিংহ, অনিল কুম্বলেকে একটু পরে মনে ধরে। আর প্রচণ্ড ভাল লাগত অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ ও'য়, গ্লেন ম্যাকগ্রা, মাইকেল বিভান-কে। গিলক্রিস্ট, পন্টিং পরে স্থান পায় আমার খাতায়। ছোটমামা ছিল একটা ক্লাবের সেক্রেটারি। খুব ট্যুর-এ যেত। বাবা-কে দিয়েছিল টেস্ট ক্রিকেটারের 'ভি' নেক সাদা রঙের নীল বর্ডার দেওয়া সোয়েটার। আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। বাবা অফিস চলে গেলে পরে দেখতাম, আমার হাঁটুর নীচে অব্দি হত ওটা!

প্রথমে টেনিসের মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, পরে কুম্বলে আর


PEPSI

সৌরভের চশমা আমাকে খুব সাহস দিয়েছিল, যে, চশমা পরলেও আমার খেলা আটকাবে না। ততদিনে কিপারের মুখনিঃসৃত বাণী শুনে-শুনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আমার গালি-ভোকাবুলারি। এই করতে করতে একদিন কর্কেট বল ছোঁয়ার সুযোগ পেলাম। ওরা নেট বেঁধে প্যাড-গ্লাভস পরে প্র্যাকটিস করত। আমি ঠায় বসে দেখতাম। ব্যাটে-বলে হত আর 'টাক' 'টাক' করে শব্দ হত। একটা ব্যাটসম্যান কতক্ষণ ধরে সুযোগ পেত। 'হাউজ দ্যাট' শব্দটাই নেই। নো-ওয়াইডও নেই! ঠিক যেন সৈয়দ আনোয়ার বহুবার তিনশোতেও অশেষ ইনিংস। সব বোলার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকেই বল করে যাচ্ছে। আমার অবাক লাগত। কী সুন্দর সাদা প্যাড, গ্লাভস, জুতো, হেলমেট-টা কালো। বলটা লাল টুকটুকে। একজন বয়স্ক লোক কনুই আর পা ধরে ধরে শটের ভুল শুধরে দিচ্ছেন। আমাকেও ব্যাট নিয়ে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'চল ক্যাচ ধরবি?' বিভিন্নরকম শক্ত শক্ত পোজে ঝাঁপিয়ে, উঁচু-নিচু ক্যাচ। বল দিলেন। কাঠের শক্ত ভারী বল। সেলাই-এর দাগ উঁচু হয়ে আছে। আমার তালুতে বন্দি ক্রিকেট! দারুণ খুশি! পরদিন থেকে বল কুড়োতাম খালি। ভাবলাম একদিন কর্কেট বল-এ খেলব। মা'কে বললাম, চলো আমাকে ক্যাম্পে ভর্তি করে দাও। মা বলল, 'ঠিক আছে আমি কথা বলব। কিন্তু যদি লেগে যায় তোর!' বোঝালাম, আমি ভাল খেলি, লাগবে না। মা বলল 'মেয়েদের একবার লাগলে আর দেখতে হবে না।' তবু কথা বলল। কিন্তু ওটা তো শুধু ছেলেদের কোচিং সেন্টার, আমাকে নেবে না। আমি যতই ভাল খেলি। শুধু শুধু খাটালো।

তখন ঝুলন গোস্বামীরা তৈরি হয়নি এ দেশে। মেয়েদের ক্রিকেট খেলাটা অনেক কঠিন ছিল। আমার এত রাগ হল যে পরের দিনই বন্ধুরা মিলে কর্কেট বল কিনলাম। পঞ্চাশ টাকা দাম নিল। লেদার ডিউস ছিল একশো টাকা মতন। কোনও গার্ড ছাড়াই আমি ব্যাট করছি। তেইশ রান। ভোলা, বিষ্টু, নাকু, চিত্রেশ, রাজীব যে যার পজিশনে ফিল্ডিং করছে। স্বপন ছিল বোলার। হঠাৎ বল হাত থেকে স্লিপ করে গেল। সেটাও শীতকাল। আমার পরনে ডাবল স্টিচের সাদা ফুলহাতা শার্ট আর সাদা-নীল বর্ডার দেওয়া ট্র্যাকসুট। মিড্‌লস্টাম্প গার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, মনে হল বলটা ফুলটস। বাঁ পা একটু এগোলাম। তারপর নাকের কাছটা খুব ঠান্ডা লাগল, জ্বলে যাচ্ছে। শীত যেন ওখানেই কামড় বসাচ্ছে। চোখ অন্ধকার আমার।

তিনদিন পর নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেলাম। আজও নাকে স্টিচের দাগটা রয়ে গেছে। এক বলে নাক বোঁচা হয়ে গেল। আর কখনও কর্কেট বলে খেলতে দেয়নি কেউ। স্বপন কতবার সরি চেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্যাম্পে জায়গা পেলাম না। এরপর আমি ক্যাম্বিসে খেলেছি। ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, অনেকেরই খারাপ লাগছে একদল ছেলের সঙ্গে আমার ওই ব্যাট পেটানো। আর আমি লম্বা হচ্ছি, পুরনো ব্যাট ধরতে গেলে কুঁজো হতে হচ্ছে। আমাদের বাড়ির জানলা এবং ছাদ—দু'জায়গাই হল মাঠের ক্লাবহাউসের মতো পজিশনে। খুব ভাল ক্রিকেট দেখা যায়। আম্পায়ারের পিছনে বা উইকেটকিপারের পিছন দিক করে দোতলার ড্রয়িংরুম আমাদের। তারপর থেকে শীতের দুপুরগুলোয় আমি খেলা দেখতাম। শীত আসার মাস দু'য়েক আগে থেকে মাটি খুঁড়ে, জল ছিটিয়ে ঘাস গজিয়ে, ঘাস ছেঁটে রোলার দিয়ে পিচ তৈরি হত। কাঁটাতারে ঘেরা থাকত ওই লম্বাটে বাইশ গজ। তারপর সবুজেটে ম্যাট পেতে সিজন শুরু। সাইড লাইনের বৃত্তের বাইরের গরুটাও চরছে তখন আমার পাশে।

পান্টু মামা আর লাল্টুদা দুই নির্ভেজাল ভালমানুষ আম্পায়ার। পিছন থেকে দেখলে মনে হয় বাঙালি ডিকি বার্ড। নিরন্তর হাসিমুখে ছেলেদের খেলাচ্ছে। ভুল স্টাম্প নেওয়া দেখলে কেমন পা শিরশির করত আমার। মনে পড়ত সেই লোকটার কথা। পিছন থেকে প্রায় আমাকে বেড় দিয়ে হাতে করে ব্যাটিং শেখানোর কথা। মাথা দপদপ করত। একদিন দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত খেলুড়ে ছেলেদের চিৎকার অসহ্য লাগতে শুরু করল। আমার ব্যাটটা বাঙ্কারে তোলা আছে। কতদিন ছুঁয়ে দেখিনি। তখন আমি দিনে-রাতে বাবার সঙ্গে ক্যারাম পেটাই। ম্যাচ বোর্ড এনে দিয়েছিল বাবা।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মনে পড়ত পিট্টুর ঘুঁটি সাজিয়ে একা আমার ওভারের পর ওভার বল করে যাওয়ার কথা। ঈশ্বর, ঠিক একদিন ভেঙে দেব তোমারও মিড্‌লস্টাম্প—মনে মনে কি বলতাম? মনে পড়ত বাবার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে ক্রিজের সাদা লাইনের দু'পাশে পা রাখা শেখার কথা, কোনটা পপিং ক্রিজ বাবা বলত, বল হাত থেকে ছাড়ার আগের মুহূর্তে মাথা সোজা রাখার কথা, মনে পড়ত লাস্ট ওভার বারো রান। কে যেন চিৎকার করছে—'বাবু, দুই নে...দুই।' শার্ট গুঁজে ক্রিকেট খেলা—মেয়েদের কী দরকার? ছোট থেকেই এমনটা শুনেছি। ব্যতিক্রম—আমার বন্ধুরা, সহপাঠীরা, মা-বাবা।

নিজের খেলা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এলেও টেলিভিশনে কোনও ম্যাচ মিস করতাম না। শচীনের জন্য বিশেষ তুক নিয়ে বসতাম। 'হিরো কাপ' দেখতে গেলাম ইডেনে। সেই প্রথম সামনে থেকে শচীনকে দেখা। লারাকে দেখা। ইডেন গার্ডেন্সে ঢোকার মুখে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে এত সার্চ করল আমাকে। নিজেকে পুরো ভিআইপি মনে হল। ষোলো বছর আগে, তখনও তো সন্ত্রাস, উলমার-মৃত্যু কিছুই ঘটেনি! আমিও যে এত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারি সেই প্রথম অনুভব করলাম। একগোছা কাগজের টুপি কিনলাম। কিন্তু কংক্রিটের গ্যালারিতে বসে বসে, আমার পিছন ব্যথা করছিল। আর লোকে অকারণে এত লাফাচ্ছিল যে আদ্ধেক খেলাই দেখতে পাইনি। ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া টেস্টও দেখলাম মাঠে গিয়ে। শেহবাগ, ধোনি, যুবরাজ, গম্ভীররা তো সেদিন এল। আমাদের সময়ের সেই হিরোরা আজ কেউ কেউ অবসরে। দ্রাবিড়-লক্ষ্মণ-সৌরভের মায়ায় আটকে একটা জেনারেশন। আমিও তেমন যে অনেকদিন হল শচীনের ব্যাটিং-এর হাইলাইট্‌স দ্যাখে। লাইভ দেখলে যদি আউট হয়ে যায়! হ্যান্সি ক্রোনিয়ে দাগা দেওয়ার পর একটা সময় অনেকদিন ক্রিকেট দেখিনি। তারপর সৌরভ, জয়সূর্য, আফ্রিদি, ইউনুস খান, মিসবা, গেইল, ইনজামাম, শোয়েব, ফ্লিনটফ, পিটারসেনদের টানে ফিরলাম। এখন ওয়ান ডে দেখি, টি-টোয়েন্টি ভাল লাগে না। প্রিয় খেলোয়াড়রা অনেকেই নেই। এখন সময় ধোনি, যুবরাজ, বীরু, গম্ভীর এবং রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের।

পাড়াক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন হওয়া আমার হয়নি। কিন্তু ক্রিকেট আমাকে দিয়ে গেছে প্রতিটি ব্যক্তিগত ব্যথায় ফোঁটাফোঁটা আর্নিকা। তবে আমি ক্রিকেট ছাড়িনি। এখনও খেলি। মনে মনে ব্যাটের 'ভি' দিয়ে খেলি। একটা উইকেট দিয়ে সোজা সোজা বল মারি। হাতে ব্যাট নেই। কি-বোর্ড আছে। রানার হয়ে গেছি। ব্যাটের বদলে কলম আছে। স্কোরবোর্ডে চার-ছক্কা ঝলসায় এখনও। দু'টো মানুষ অবিরত ব্যাট করে চলে আমার হয়ে, কম্পিউটার স্ক্রিনে। আমি শুধু রাইট কি, লেফট কি প্রেস করে যাই। এক দুই চার ছয় রান হয়। বল মিস করি, উইকেট পড়ে। প্রতিপক্ষ উল্লাস করে। স্ক্রিনের স্টেডিয়াম জুড়ে দর্শকের হল্লা। মাথা নাড়ে ওরা প্রতিটি ওভার বাউন্ডারিতে। আমি শুনতে পাই না। কানটা খানিক গেছে হয়তো। লোকটা ব্যাট তোলে আর নামায়। তোলে আর নামায়...আমার চোখের পাতা জুড়ে আসে। আঠা লেগে যায় যেন। সেই ব্ল্যাক টেপের আঠাটাই কি, যেটা আটকে ব্যাটের ছেঁড়া গ্রিপ ঠিক করতাম? কোমর টনটন করে। চেয়ারে বসে বসে পা ধরে যায়। পা-টা ঠিক জায়গায় আছে তো। এল বি খেয়ে যাব না তো? যাহ...ওভার শেষ। পাব না আরেকটা চান্স? পিচ ছুঁয়ে বলছি—এই তো প্যাড, গ্লাভস, গার্ড, হেলমেট সব রেডি—ইন্ট্রো থেকে লিখব আবার...।

সম্ভবামি যুগে যুগে

কাগজ পাকিয়ে প্লাস্টিক জড়িয়ে গাডার মেরে বল। সত্যিকারের সেলাইওলা ডিউস বল। কম্পিউটারে টকাস লাফিয়ে পড়া ভার্চুয়াল বল। ক্রিকেট গড়াল বহুদূর। জীবনও।

ঈশ্বরের মুখরক্ষা করতে গিয়ে শেষমেশ যখন ধরাধামে আবির্ভূত হলাম স্বয়ং, তখন আমি নেহাতই শিশু আর কী—হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স-টার্স কিছুই বিশেষ মনে নেই—বাপ, না মা, না কি ফার্স্ট সিনেই ওংকার উচ্চারণ করেছিলাম, কে জানে—কোন সে তারাখসা মুহূর্তে ল্যাজের গোড়ায় জোর হল আর পক করে উঠে বসলাম—আছাড় খেতে খেতে শেষে আপন পদমর্যাদায় উঠে দাঁড়ালাম টানটান—বলো বীর, বলো উন্নত মম শির, বলো এঙ্গেলস তাঁর বইতে কেন আমার কথা লিখলেন না?

আসলে এসবই প্রি-হিস্টোরিক জমানার কথা—

গোটা একটা বাচ্চার জন্ম দিতে পারলেই বাপমায়েরা যেমন আদেখলের মতো লেগে পড়েন চারপা তুলে—ধ্যাবড়া কাজল হতভম্ব দশা, গামলায় স্পা দশা, হাতে ঝুনঝুনি দেবতা দশা—যতরকমের যা যা কিছু হতে পারে, ছবি তুলে তুলে সে বাচ্চার যেমনি ব্যক্তিগত দশা বলে আর কিছুই বাকি থাকে না—আমারও অমন ভরা অ্যালবাম আছে—তারই মধ্যে একটি ছবিতে আমি একটি প্লাস্টিকের ব্যাট হাতে দিগম্বর দণ্ডায়মান দশায় জ্বলজ্বল করছি—এই ছবিটিই সম্ভবত আমার এবং ক্রিকেটের পারস্পরিক পরিচয়ের প্রথম প্রমাণ—ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট—

জনশ্রুতি হল, সে সময় প্রধানত নিজে মুখে তা-তা-তা-তা গর্জন করতে করতে মেঝেতে, দেওয়ালে, আসবাবে, মানুষে ঠুকে ঠুকে ঠুকে ঠুকে প্রলয়নৃত্য করে আপন অস্তিত্ব ও অস্মিতা জানান দেওয়ার কাজেই ব্যাটটার একমাত্র ব্যবহার হত—

আমাদের বসার ঘরে রোজ আসর বসত—পাড়ায় বোধহয় আমাদের বাড়িতেই টিভি ছিল তখন—কিংবা যাদের যাদের বাড়ি টিভি ছিল, তার মধ্যে একমাত্র আমাদেরটাই ধর্মশালা ছিল—মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বা সপ্তপদী দিলে চৌকি, সোফা ছাড়িয়ে, টুল চেয়ার যোগ করে শতরঞ্চিও ভর্তি হয়ে যেত গ্যালারি—

একদিন সাতসকালেই দেখি, ভিড় হয়েছে—বাবা বালিশ-টালিশ এনে সিংহাসন সেট করে, টিভির দরজা খুলল—টিভিতে একটা মাঠে দু-চারটে লোক এপাশ ওপাশ করছিল—তারপর দু'টো লোক এসে আকাশে পয়সা ছুড়ল, সেটা মাটিতে পড়ল—মাটি থেকে তুলে সেটা মাথায় না ছুঁইয়ে তারা হাসি হাসি মুখ করে হাত মিলিয়ে বাড়ি চলে গেল—এ কী অনুষ্ঠান কে জানে—এদিকে, ফুলকাকা রেডিও নিয়ে আসতে টিভির সাউন্ড বন্ধ করে দেওয়া হল—টিভিতে হিন্দি কথা হচ্ছিল—রেডিওয় বাংলা—

'—ঘড়িতে এখন সকাল ন'টা বেজে সাত মিনিট ছাপান্ন সেকেন্ড—প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ ইডেন উদ্যান থেকে ধারাবিবরণী দিচ্ছি অজয় বসু—সিরিজের এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারতীয় দলের অধিনায়ক সুনীল মনোহর গাভাসকর টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—শ্যামলসুন্দর ইডেনের অমলিন ঘাসের বুকে ওই যে বাইশ গজ জমি এই মুহূর্তে শান্ত হয়ে রোদ পোহাচ্ছে, আরেকটু পরেই সেখানে শুরু হবে মহারণ—শীতের এই কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে গায়ে একটু রোদ লাগিয়ে নিচ্ছে একটি কাকও—ঠিক ক্লাব হাউসের সামনেটায়—সবুজ গালিচায় কালো কাক—ভারি সুন্দর লাগছে—'

টিভি-র ছবি আর রেডিও-র আওয়াজ একসঙ্গে চালানোর কী মানে, কিছুই বুঝতে পারলুম না—টিভিতে একদল লোক সাদা স্কুলড্রেস পরে হাত-পা ঘোরাতে ঘোরাতে মাঠের মধ্যে হেঁটে চলল—আমার ব্যাট দিয়ে টিভির নীল কাচের ওপর দু'বার ঠকঠক করতেই সেটা আলগা হয়ে পড়ে গেল—বাবা অ বলে চোখ গোল করে ব্যাটটা নিয়ে নিল—আমার কান্না শুনে ঠাকমা এসে আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে দু'টো দানাদার দিল—আমি ফেলে-ছড়িয়ে, গায়ে-মাথায় মেখে তাই খেতে লাগলুম— টিভি-রেডিওর ব্যাপারটা কিছুই জানতে পারলুম না—



রবার যুগ

বাড়িতে জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো, মাঝেমধ্যে পিসতুতো-মামাতো ভাইবোন মিলিয়ে আমাদের আট-ন'জনের ব্যাচটার যখন জ্ঞান হওয়ার লগ্ন ঘনিয়ে উঠছে—তখন রাঙাকাকা এক রোববার আমাদের একটা কাঠের ব্যাট এনে দিল—তার সঙ্গে রবারের একটা কালো বল—পৃথিবীর বুকে শুরু হয়ে গেল রবার যুগ—

রাঙাকাকাই প্রথম আমাদের দেখাল, কীভাবে ব্যাট ধরতে হয়—কীভাবে বল করতে হয়—ক্যাচ ধরতে হয়—আমরা সবাই একে একে ব্যাট করলুম, বল করলুম—কে আগে ব্যাট করবে, সেই নিয়ে ঝামেলা বাঁধতে রাঙাকাকাই আমাদের শিখিয়ে দিল লটারি করা—ব্যাট চেপে লটারি—

যতজন আছে, ততগুলো সংখ্যা আগে-পরে গুলিয়ে লিখে—ধরো পাঁচজন—এবার, ২,৫,৩,১,৪ এভাবে লিখে প্রতিটি নম্বরের নীচে দাগ টানতে হবে—তারপর এমন করে ব্যাটটা রাখতে হবে, যাতে নম্বরগুলো ব্যাটের নীচে চাপা পড়ে যাবে, অথচ দাগগুলো বেরিয়ে থাকবে—সবাই এসে একটা একটা করে দাগে আঙুল রাখলে তারপর ব্যাট সরাও—অমনি সবাই যে যার নম্বর পেয়ে যাবে—জানা যাবে, কে কখন ব্যাট করবে—ব্যস!

কিন্তু, রাঙাকাকা, কে কখন বল করবে? ঠিক উল্টো—প্রথমে পাঁচ নম্বর, তারপর চার, তিন—এইভাবে—

সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল—সকালে একবার, বিকেলে একবার শুরু হয়ে গেল খেলা—দু-চারদিনের মধ্যে পাশের বাড়ি, পাশের পাশের বাড়ি, ওপাশের বাড়ি থেকে আমাদের সাইজের একটা-দু'টো করে জুটতে লাগল—টাবলু, মৌ, পিকলা, টুসি, তুলতুলি—ঐতিহাসিকভাবেই প্রকৃত পাড়া ক্রিকেটের জন্ম হল আমাদের বাড়ির সামনের বাঁধানো জায়গাটায়—রাঙাকাকার ঔরসে—

রবার যুগের এই সময়টায় রবারের বল বলতে কালো রঙের ফাঁপা রবারের বল—এ বলের সুবিধা অনেক—সবচেয়ে বড় সুবিধে, এ বল জলে ভাসে—কোলকাতা শহরে রাস্তার দু'পাশে তখন খোলা নর্দমা—তাতে বারবার এ বল পড়ত, কিন্তু ডুবত না কখনও—উবু হয়ে বসে হুমড়ি খেয়ে তুলে আনলেই হত—বড়রা কেউ দেখতে না পেলে কোনও কেস নেই—শুধু পিকলা একবার ব্যালেন্স রাখতে না পেরে কাত হয়ে নর্দমায় উল্টে গিয়েছিল—টিউকলে চান করিয়ে দিয়েছিলাম—তাতে তার ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশি জ্বরটর হয়ে একসা—পিকলাটার কপাল খারাপ—আর হপ্তাখানেক বাদে পড়লেই আর অবেলায় চান



ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়



করতে হত না—কর্পোরেশন থেকে পাঁক তুলে দিয়েছিল—পরিষ্কার জল—ওপর থেকে নীচ দেখা যায়—

মদ্দিখানে, আবার ঝামেলা লাগল টাবলুকে নিয়ে—দেখা গেল, টাবলু রোজই ফাস্টে বা সেকেন্ডে ব্যাট পাচ্ছে—খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমনিতেই শেষের দু-তিনজন করে ব্যাট পায় না, সন্ধে হয়ে যায়—ফলে টাবলুর ওপর রাগটা ক্রমশ বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছিল—এখন কথা হল, টাবলু তো লটারি থেকে ফাস্ট সেকেন্ড হয়—কার কী করার আছে?

টুয়াদিদি একদিন শার্লক হোম্‌স হয়ে গেল অবশেষে—ধরে ফেলল টাবলুর ট্রিক—দেখা গেল, বেশিরভাগ দিনই টাবলু আগ বাড়িয়ে লটারি করতে যায়—এবার এক বা দুই নম্বরটা প্রথমে লেখে—ধরো ১,৬,৩,৫,২,৪—তার তলায় দাগটাও ছোট করে টানে—আর ব্যাটটা, নিজের হাতটা এমন কায়দা করে রাখে যাতে দাগটা প্রায় দেখাই যায় না—ফলে বাকিরা অন্যগুলোয় আঙুল রাখে আর টাবলু রোজ প্রথমে ব্যাট পায়—রহস্যভেদ—

মৌ টাবলুর চুলের মুঠি ধরে, টেনে, মাটিতে ফেলে, বুকের ওপর উঠে বসল—আমরাও সবাই মারলুম এক হয়ে—বড়ো কে যেন এসে ছাড়িয়ে থামাল আমাদের—সকলেই যার যার বাপমায়ের হাতে প্যাঁদানি খেলুম আচ্ছা করে—ক'দিন বন্ধ রইল খেলা—

শান্তি ও সংহতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্রমে আবার একসময় শুরু হল ক্রিকেট—লটারির নতুন নিয়ম আবিষ্কার হল—বাকি সকলের দিকে একজনকে পিছন করে দাঁড় করিয়ে, তার পিঠে একজন হাতে করে নম্বর দেখাতে লাগল আর সে বলতে লাগল একেকজনের নাম—সর্বসমক্ষে লটারি—দুর্নীতি নির্মূল হয়ে গেল চিরকালের মতো—সমস্যা দেখা গেল অন্য জায়গায়—খেলতে খেলতে সকলকারই শটের জোর বাড়ছিল—ফলে বলের এক সাইড আলু হয়ে ফেটে যেতে লাগল—ডিম ফাটার মতো আধাআধি খুলে যেতেও লাগল কয়েকটা—আর বল ফাটার এই ক্রমবর্ধমান হারে খেলা প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়—

সারাক্ষণ হুটোপুটি, চিৎকার, ঝগড়াঝাঁটির চোটে বাপমায়েরা এমনিতেই খেলা নিয়ে বিরক্ত—অন্তত বল ফেটেও খেলা খানিক বন্ধ হলে তারা একটু শান্তি পায়—তাই তারা কখনওই বলের পয়সা দিত না—রাঙাকাকা থাকলে দিত—না থাকলে আমরা পাড়ার দোকানে বাকিতে বল নিয়ে আসতুম—পরে বাপের পকেট ঝেড়ে হোক বা রাঙাকাকার কাছ থেকে নিয়ে হোক, মিটিয়ে দিতুম—আমার মায়ের ব্যাগে পয়সা থাকত, মেজজেঠিমার তাকে পাতা খবরের কাগজের তলায়—টুয়াদিদির



মা'র রান্নাঘরে একটা কৌটোয়, পিকলার ঠাকমার সেলাই বাক্সে, মৌ-এর ঠাকমার গীতার মধ্যে—এভাবে সবসময় চলত না—পাড়ার দোকানের বুড়োদা-ও আর বাকিতে বল দেবে না বলেছিল—বল ফেটে গেলে বা উড়ে গেলে হিসাব রাখা ঝামেলা, তাই—

আমি বললুম, স্কুলে তো বাঁধাই খাতা ব্যাট করে, কাগজ পাকিয়ে গাডার বেঁধে বল হয়—অভাবের সময় স্কুলের অভিজ্ঞতাই কাজে লাগল পাড়াতেও—কাগজ পাকিয়ে, তার ওপর প্লাস্টিক দিয়ে, তারপর গাডার মারা হল—নর্দমায় পড়লেও ক্ষতি নেই—বিজ্ঞানের জয় হল—

স্বভাবে রবার, অভাবে কাগজ পাকানো—খেলা থেমে রইল না—অনেকদিন বাদে, হঠাৎ রাঙাকাকা এসে আমাদের গাডার মারা বল কেড়ে নিল—খুব করে বারণ করল ওরম বলে খেলতে—কেউ বুঝলাম না কেন—রাঙাকাকা বলল, যা বলছি শোন, তক্কো করিস না—

রাঙাকাকার কথা রাখলুম আমরা—এই ব্যাটটা ততদিনে ঢলঢল করছিল—রাঙাকাকা বলেছিল আবার নতুন ব্যাট কিনে দেবে—

মদ্দিখানে কে কোত্থেকে জেনে আসল, ক্রিকেট খেলার আসল বল লাল রঙের হয়—তাতে সেলাইসুতোর দাগ থাকে—ডিউস বল নাম—

টুয়াদিদি একদিন একটা ফাটা বলকে বেশ করে ওয়াটার কালার লাল করে, ঠাকমার ছুঁচসুতো দিয়ে সেলাই করতে গিয়ে হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্তারক্তি—তারপর একদিন টাবলু ওপাড়ার দোকানে দেখতে পেল এক ধরনের লাল রঙের বল—সত্যিকারের লাল রঙের—অনেকটা ভারী—হেবি ড্রপ খায়—সলিড রবার—রবার ডিউস—গায়ে সেলাই সেলাই খাঁজকাটা দাগও আছে গোটা গোটা—এই তো, আসল ক্রিকেট বল—অবশেষে আমরা জাতে উঠলুম—

ও-পাড়ায় মাঝে মাঝেই বল কিনতে যেতুম—বাবুন, মুন্নাদের সঙ্গে আলাপ হল একসময়—একদিন দু'দিন ওদের সঙ্গে খেললুমও—ওরাই বলল, ছোট রাজু বলে ওদের পাড়ায় একটা বাচ্চা ছিল—ভাল পাঁচিল চড়তে পারত—পাড়ার পাম্পের ঘরের মাথায় একদিন বল উঠে গিয়েছিল—ও পাড়তে গিয়ে অনেকগুলো দড়ি-পাকানো বল দেখতে পায়—একটু বড়, অনেকটা গাডার বাঁধা বলের মতোই দেখতে—হেবি উৎসাহে একটা তুলে ড্রপ খাওয়াতেই বার্স্ট্—শেষ—

বুঝলুম—রাঙাকাকার বারণ—

রবার যুগের শেষে আমরা পাড়ার মাঠে এসে পৌঁছলাম—কারণ, রবার ডিউস বড্ড বেশি ড্রপ খায়—বড় জায়গা লাগে—তাছাড়া, নর্দমায় পড়লেও ডুবে যায়—আর আমরাও তো হাতে-পায়ে বেড়েছি অনেকটা করে—এক চিলতেয় কুলোয়?

কর্কেট যুগ

কর্কেট যুগের শুরুতেই ধামাকা—

মেথরপট্টির খোট্টাদের ধরে, ঢোলফোল বের করে, রাত্তিরবেলায় পাড়ায় সে কী নাচ—লাল্টুকাকা মালটাল খেয়ে বমিটমি করে একসা—ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ডকাপ জিতেছে—

সে অবধি আমরা টিভিতে তেমন খেলাটেলা দেখতুম না—ক্রিকেট তো নয়ই—সারাদিন বসে দেখার চেয়ে নিজেরা খেলতুম, সেই ভাল—গাভাসকারের নাম জানতুম, ব্যস—

এবার খেলা দেখাও শুরু হল—আর সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল সব কিছু—খেলাটা যে মোটেই লটারি করে হয় না, বরং দু'টো টিম করে হয়, জানলুম—রানের হিসেব, ওভারের হিসেব, উইকেট পড়া জানলুম—এতদিনে পরিষ্কার হল নিয়মকানুন—জানলুম, ডিউস বলের সঙ্গে রবারের কোনও যোগাযোগ নেই—

চামড়ার বলের ক্ষমতা আমাদের ছিল না—চার, পাঁচটাকায় একটা শক্ত লাল বল বাজারে ছেয়ে গেল—শুরু হয়ে গেল কর্কেট যুগ—

বিপত্তি হল, এত ভারী বল আমাদের ব্যাটে খেলা যায় না—আর ঠ্যাঙে লাগলেও হাড়ে ঠং করে ওঠে—ফলে, প্রথমেই বন্ধ হয়ে গেল জোরে বল করা—অথচ, আউট করতে গেলে কিছু তো করতে হবে—প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানের অগ্রগতির তত্ত্ব আবার নির্ভুল প্রমাণিত হল—স্পিন বোলিং—আঙুলের প্যাঁচে বল লাট্টু—

মাঠে এসে সঙ্গীসাথীর সংখ্যা বাড়ল অনেক—দশটাকা দশটাকা করে চাঁদা তুলে কেনা হল নতুন ব্যাট—কাঠের ওপর পার্চমেন্ট মারা—তার ওপর চার জায়গায় সরু দড়ি দিয়ে এঁটে বাঁধা—উইকেটও কেনা হল চারটে—ব্যাটিংয়ের দিকে তিনটে, বোলিং প্রান্তে একটা—রাঙাকাকা মাঝে মাঝে এসে আম্পায়ার দাঁড়াত—সবাই আসার আগে, হয়তো সবে দু'জন এসেচে—একটু ব্যাটও করত কখনও—রাঙাকাকার বন্ধুরা কেউ খেলাধুলো করত না—তাস পিটত আর রক মারত সারাদিন—

আমরা আস্তে আস্তে টিম করে খেলতে লাগলুম—সাতজন বা আটজন করে টিম—দশ ওভার করে খেলা—ওয়ান ডে

ক্রিকেটের নিয়ম মেনে—এপাড়া ওপাড়া সেপাড়া মিলিয়ে রোজ অনেক ছেলে—কাকাজ্যাঠারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত সবাই—রোববার করে বা ছুটির দিনে পনেরো ওভার করেও খেলা হত—কুড়িটা কখনও হয়নি—

পিকলা ক্রমশ নাম করতে লাগল—বিশেষত ব্যাটিংয়ে—নানারকম কায়দা করে ফিল্ডারদের মাঝখান দিয়ে বল গলিয়ে দিয়ে শট মারত—ঝাঁপিয়ে পড়ে, শুয়ে পড়ে ক্যাচ নিতে পারত—কেতায় স্টান্স নিত—আর স্পোর্টসস্টার কিনত প্রতিটি সংখ্যা—আমাদের মাঠের পাশে দেওয়ালটা আস্তে আস্তে ভরে উঠল কাটা কাটা ছবিতে—কপিলদেব, গাভাসকার, অমরনাথ, বিনি, শ্রীকান্ত, শাস্ত্রী, মনিন্দর সিং—

দেওয়ালটা যাদের বাড়ির, তাদের সঙ্গে আমাদের রোজ রোজ ঝামেলা বাঁধত—কর্কেট বল ডম ডম করে গিয়ে ঠকাস ঠকাস লাগত দেওয়ালে—মাঠের দিকে ফেস করা ওদের ওপেন উঠোন—এক সাইডে টিনের চাল কলতলা—উঠোনে সৌরশক্তিতে জল গরম হত শীতকালে—মাঝে মাঝেই বল লেগে বালতি ঝন করে উঠত—মগটগ ডিগবাজি খেত—সে বাড়ির বুড়িটা সবেতেই কাঁইকাঁই করত—বল ফেরত দেবে না বলে হুমকি দিত—একেকদিন সত্যিই বল আটকে রেখে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে ঝগড়াও করত—একদিন কলতলার টিনের ফাঁক দিয়ে বল গলে ঢুকে গেল—বুড়ি তখন চান করছিল, ভেজা কাপড়ে জিনাত আমন বেরিয়ে এসে দু'ঘণ্টা চিৎকার করে গেল—সারা পাড়ার লোক জড়ো হয়ে সে এক দেখার মতো ব্যাপার—

বাবলুদা পার্টি করত—সব ব্যাপারে বিচার করত সে—বাবলুদা বলল, মাসিমা, আপনি উঠোনের এপারে পাঁচিল তুলে দিন—বুড়ি তাও করবে না—চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো তার বাড়িতে বল মারবে বলে সে পয়সা খরচা করে পাঁচিল তুলবে কেন? তখন বাবলুদা বিধান দিল, বুড়ির উঠোনকে গার্ড করে মাঠের সাইডেই আমাদের একটা ক্লাবঘর হবে—তাতে আমাদেরও একটা ঘর হল, বুড়ির বাড়িতেও বল লাগল না—আমরা বললুম, আমরা পয়সা পাব কোথায়? বাবলুদা বলল, আমি দেখছি—

একমাসের মধ্যে আমাদের একটা ক্লাবঘর হয়ে গেল—পোড়াতলা প্রগতি সংঘ—এক রোববার সকালে এমেলে, কাউন্সিলর, আরও কারা কারা সব এসে উদ্বোধন হল ক্লাবের—তাতে টাবলু রবিগুরু কবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কী একটা লম্বা কবিতা বলেছিল—তার আগাপাশতলা কিছুই মনে নেই—শুধু শেষ লাইনটা সকলের মনে ছিল—ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের সাথে—অদ্ভুত সুর করে তিনবার একই লাইন বলেছিল—তারপর থেকে খেলতে এলেই টাবলুকে সবাই ওই লাইনটা বলত—যত ও রেগে যেত, তত আরও বলত—তারপর থেকে আর কখনও, পাড়ার আর কোনও অনুষ্ঠানে টাবলু কিছু করেনি—এমনকী আসতও না পর্যন্ত—

ক্লাবঘরে পার্টির জিনিসপত্র থাকত—ফ্ল্যাগ, পোস্টার, দড়ি, কাগজ, দেওয়াল লেখার রং তুলি—আমরাও এককোণে আমাদের ব্যাট, উইকেট-টুইকেট রাখতুম—রাঙাকাকা কখনও কোনওদিন সে ঘরে ঢোকেনি—

ক্যাম্বিস যুগ

এলাকার সব ক্লাব নিয়ে বিরাট নক আউট টুর্নামেন্ট হবে—আমাদের ক্লাবও তাতে খেলবে—ক্যাম্বিস বলে খেলা—ফলে, ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতেই আমরা চলে এলাম ক্যাম্বিস যুগে—

ততদিনে আমাদের মাঠ কুপিয়ে-টুপিয়ে, মাটি ফেলে ফেলে সমান করা হয়েছে—বাবলুদা কী কায়দা করে কর্পোরেশনের রোলার এনে চালিয়ে দিয়েছে দু'বার—মাঠ একেবারে মেঝের মতো প্লেন—সাইডের ঝোপঝাড় কেটেকুটে মাঠটা বেশ এক মাঠের মতো মাঠ হয়েছে শেষমেশ—

কর্কেট যুগের শেষ থেকে ক্যাম্বিস যুগের শুরুর মধ্যে মেয়েরা খেলা ছেড়ে দিয়েছে একে একে—টুয়াদিদি অবশ্য পাকিস্তানের ম্যাচ থাকলে এখনও নাছোড়বান্দা টিভির সামনে বসে—ওর সমস্ত নোটখাতার মলাটে জ্বলজ্বল করে ইমরান খান—

ক্যাম্বিস বল নিয়ে আমাদের রোজ খেলা চলছে দারুণ—কর্কেট যুগে আঘাতের ভয়ে যেমন বলের গতি কমে গিয়েছিল, হাত খুলে শট মারা যেত না, ক্যাম্বিসে পৌঁছে আমাদের খেলা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল—টিভিতে দেখা ক্রিকেটের মতো দৌড়ে এসে লাফিয়ে হাত ঘুরিয়ে জোরে বল করা শুরু হল—সপাটে ব্যাট চালানো শুরু হল—এমনকী এগিয়ে এসে ছয় মারাও শিখলাম আমরা—

পিকলা ততদিনে ময়দানে একটা ক্লাবের ক্যাম্পে প্র্যাকটিস করে—সামনের বছর নাকি আন্ডার থার্টিন খেলবে—আমরা একদিন ওর নতুন ব্যাট, প্যাড, গ্লাভ্স দেখতে গেলুম—তলায় কাঁটা দেওয়া জুতো দেখলুম—আর, জীবনের এতকালের এক বিরাট জিজ্ঞাসার অবসান হল—একেবারে সত্যিকারের চকচকে পালিশ করা চামড়ার, সেলাই করা টুকটুকে লাল বল দেখলুম স্বচক্ষে—স্বহস্তে নিয়ে দেখলুম, নেড়ে দেখলুম, চেড়ে দেখলুম, ড্রপ খাইয়েও দেখলুম দু'বার—দিব্যি—

১৫ অগাস্ট রেল কোয়ার্টার মাঠে টুর্নামেন্ট—পাঁচ ওভার করে খেলা—মাঠে বাঁশের পোস্ট খাটিয়ে লাইট লাগিয়েছে একঘর—পিচে ক্রিজ এঁকেছে চুন দিয়ে, বাউন্ডারিও তাই—দু'দিকেই তিনটে করে উইকেট—ভোর থেকে ডিম-পারুটি, ডিম-পারুটি গান বাজছে টানা—এলাহি ব্যাপার—

হঠাৎ ডিম-পারুটি থামিয়ে আকাশভরা-সূর্যতারা শুরু হল—চাদ্দিক থমথমে—একজন মন্ত্রী এলেন—মালাটালা পরলেন—এলাকার যুবসমাজ ও ক্রীড়ার গুরুত্ব নিয়ে লম্বা টানলেন কিছুক্ষণ—এই টুর্নামেন্ট, এই যে সমস্ত ক্লাবের সংগ্রামী ঐক্য, তাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে, বললেন—কী আশ্চর্য, বাবলুদার কথায় সাক্ষরতার মিছিলে গিয়েছিলাম, সেখানেও একজন মন্ত্রী বলেছিল, শিক্ষার অধিকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে—বন্যাত্রাণে চাঁদা তুলেছিলাম, তাতে গ্রামবাংলাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে—কি অপূর্ব অন্ত্যমিল সবার—

লেবুবাগানের সঙ্গে ম্যাচটায় আমার চোখটা এদিকে গেল—প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানকে সমানে বিরক্ত করা ফিল্ডারদের অন্যতম গুরুদায়িত্ব ছিল—ওদের একটা মাল তেড়ে প্যাঁদাচ্ছিল আমাদের—বলে বলে চার, বলে বলে ছয়—তাকে প্রথমে এমনি আওয়াজ দিলুম কিছুক্ষণ, তারপর গান গাইলুম 'ঝুম্মা চুম্মা দে দে', একটুআধটু শালা-শুয়োরের বাচ্চাও বললুম বেশ করে—ব্যাটা কিছুতেই কিছু হয় না—শেষে কাঁচা খিস্তি শুরু হল—তখনও অবধি যা যা শিখেছি, পরপর নামতা পড়ে গেলুম টানা—ছেলেটার গায়ে লাগে না তবু—আমি ক্লোজ-এ, প্রায় ব্যাটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে খিস্তি করছি, খিস্তি করছি—মুন্নার একটা বলে সে শালা সপাটে ঝাড়ল শট—বলটাকে প্রায় দেখতেই পেলুম না—আমার ডানচোখে ঝং করে অন্ধকার হয়ে গেল—মাথা বোঁ, কানে ভোঁ, ফ্ল্যাট—

রুম্পাদের বাড়ি দিয়ে বরফ নিয়ে যায়, রুম্পাদের বাড়ি দিয়ে বরফ নিয়ে আয়—বেঞ্চে শোয়া, হাওয়া ছাড়, হাওয়া ছাড়—টাবলুর সঙ্গে এর মাঝে ব্যাটসম্যানটার গালাগালি থেকে হাতাহাতি লেগে গেল—মাঠে সব লোক ঢুকে পড়ে ধাক্কাধাক্কি, চড়-থাবড়া স্টার্ট—লেবুবাগানের ছেলেরা উইকেট-ফুইকেট উপড়ে নিয়ে নেমে পড়ল—মাঠের পাশে যে প্যান্ডেলে আমি বেঞ্চে কাত, সেখানে একটাও লোক নেই—পার্টির লোকেরা ঝামেলা থামাতে গিয়েছে—একা রুম্পা বরফ নিয়ে দাঁড়িয়ে—বাঁ চোখেই ভাল করে দেখলুম তাকে—দিব্যি পেয়ারা পেয়ারা চেয়ারা—মাঠময় সংগ্রামী ঐক্য রক্ষার লড়াই—আর রুম্পা রক্ষা করছে আমার চক্ষের মণি—

আহা, আমি কেন রোজ রেলের মাঠে খেলতে আসি

না—কেন যে রোজ চোখ ফাটে না আমার—

কোন সে ম্যাজিকে কে জানে, আমরা সেদিনকার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলাম—একঘর একটা গামা শিল্ড পেলাম—কে একটা সাইকেল ভ্যানে তুলে দিল সেটা—ঠাকুরের মতো দাঁড় করিয়ে তার মুখে হ্যালোজেনও ফিট হয়ে গেল—সাইকেল রিকশায় চলে এল ব্যাঞ্জো—লাল্টুকাকাও কী করে যেন মালটাল খেয়ে হাজির—সারা রাস্তা নাচতে নাচতে, পুরো এলাকা ঘুরে পাড়ায় ফিরলাম বীরের মতো—পাড়ায় আরও একঘণ্টা নাচ হল—ডিমপারুটি, ডিমপারুটি—তার মধ্যেই বাবলুদা বলতে লাগল, এই সাফল্যের শিল্ড আমাদের চোখের মণির মতো—দূর বে, সর—নাচতে দে এখন—ডিম্পারুটি ডিম্পারুটি—

প্লাস্টিক যুগ

পরের রোববার ক্লাবের ফিস্ট হল—আমাদের শিল্ড জয়ের আনন্দে—আমার চোখ প্রায় সেরে এসেছিল—পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে আবার গেল—উনুনের ধোঁয়ায় ফাইনালি—খাওয়াদাওয়ার শেষে বাবলুদা বলল, আমাদের মাঠে ফ্ল্যাট হবে—বর্ষা শেষ হলেই কাজ শুরু হবে—

আমরা চলে এলুম রাস্তায়—মানে গলিতে—শুরু হয়ে গেল প্লাস্টিক যুগ—

আসলে গলির খোয়ায় একদিনেই তিন তিনটে ক্যাম্বিস বলের হরিনাম খাবলা খাবলা হয়ে গেল—পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে তার জায়গায় এল শক্ত প্লাস্টিকের বল—ফ্লুরোসেন্ট কালারের—

গলিতে এসে আরও একটা পরিবর্তন এল আমাদের ক্রিকেটজীবনে—খোয়ায় দৌড়ে এসে হাত ঘুরিয়ে বল করা আর গেল না—পাঙ্গুর নখ উপড়ে গিয়ে আমাদের নতুন শিক্ষা হল—আমরা আবার স্লো বলে ফিরে গেলাম—

খেলার মেজাজও হারিয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে—এর টিউশন, ওর ছক—সবাই ঠিক সময়ে আসতে পারত না—আমি টাবলুকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই রেলের মাঠে খেলা দেখতে যেতুম—রুম্পাকে আর কখনও দেখতে পাইনি—

একদিন রেলের মাঠ থেকে ফিরছি—বুঝলুম, চাদ্দিকে একটা গরম গরম ব্যাপার কিছু হচ্ছে—কে জানে, আবার কোথাও ঝামেলা হল কি না—পাড়ায় ফিরে দেখলুম, লোকের মেলা—বাবলুদা উত্তেজিত হয়ে হাঁপাহাঁপি করছে—

ফাইনালি বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়ে গিয়েছে আজ—

বনধ ডাকা হয়ে গিয়েছে দেশজুড়ে—বাবলুদা অন্য কথা বলছে—খবর আছে, কলকাতার নানা জায়গায় ঝামেলা শুরু হয়ে গিয়েছে—রাজাবাজারে একটা মন্দির অ্যাটাক হয়েছে—আমাদের দিকেও চলে আসতে পারে—এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে এখন—

দাদা-কাকারা রাত জাগবে—আমরাও জাগতে চাইলুম—সকলে বারণ করল—ব্যাঙাদা, বুড়োদার কোমরে মেশিন—পার্টি অফিসের টালি সরিয়ে আরও অনেক কিছু বেরোল—সব কিছুর নাম জানতাম না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম—বারান্দা থেকে বাবা চিৎকার করে বাড়ি ঢুকতে বলল—খেতে বসেছি, রাঙাকাকা এসে জিগ্যেস করল, তোদের ব্যাট-উইকেটগুলো কোথায়?

তারপর ক'দিন কার্ফু হল কলকাতায়—পুলিশের গাড়ি রাউন্ড দিতে থাকল পাড়ায় পাড়ায়—বুটের আওয়াজ, শুনলাম, জওয়ানদের—সব বন্ধ—স্কুল, কোচিং সব—ফলে ওই ক'দিনের হঠাৎ ছুটিতে আবার পুরোদমে খেলা হল আমাদের—গলিতে কার্ফুর লোকেরা কিছু বলত না—দুপুরের স্নান খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে প্রায় গোটা দিন খেলা আর খেলা—ফুর্তির প্রাণ ফুলটুস—

ছাদে উঠে তখন রোজ দেখতুম, ট্যাংরার বস্তি জ্বলার বিশাল ধোঁয়া—দিন তিনেক তো ছিলই—পাশের বাড়ির রাই-ও দেখত লেপ তুলতে এসে—অনেকদিন পর ওকে দেখলাম—আসলে ওর ইংলিশ মিডিয়াম—সকালে স্কুল, দুপুরে ছুটি—আমার বেলায় স্কুল, বিকেলে ছুটি, তারপর কোচিং-টোচিং থাকে—সময়টা মেলে না—কেমন আছিস? রাই কথা বলল না—কেমন একটা হেসে ঘাড় নেড়ে নেমে গেল—

কার্ফুর ক'দিন সব বন্ধু পাড়ায় ছিল—যাদের যাদের সঙ্গে বহুকাল দেখা হয় না, তারাও ছিল—মেয়েদের সঙ্গে তো যোগাযোগই ছিল না কতদিন—মৌ, টুয়াদিদি, তুলতুলি, টুম্পা—আমাদের খেলার মাঝে মাঝে গল্প হল কতদিন পর—টুয়াদিদি বাড় খেয়ে ক'টা বলও করল টাবলুকে—টুম্পা হঠাৎ একটু ব্যাট নিল—হইহই লেগে গেল বেশ—টুম্পা একটাও বল ব্যাটে কিন্তু লাগাতে পারল না—কাকিমা হাঁক দিলেন—মৌ, বাড়ি এসো—

সেদিন রাতে টুয়াদিদিদের ছাতে আবার ফিস্ট হল—খিচুড়ি আর ডিমভাজা—মৌকে কাকিমা ছাড়লেন না—ওর নাকি শরীর ভাল নেই—ছাতে হিম লাগলে জ্বর এসে যাবে—

সেবার শীতকালটা আমাদের সকলের বেশ কাটল—কার্ফুটার্ফু মিটে সব কিছু নর্মাল হওয়ার ক'দিনের মধ্যেই আবার শীতের ছুটি—আবার খেলা, আবার আড্ডা—একেবারে ছোটবেলার দিনগুলো যেন ফিরে এল আবার—ছেলেমেয়ে সবাই মিলে খেলা হল চুটিয়ে—আবার ফিরে এল সেই পিঠে করা লটারি—৭,৫,৪,৬,১,৩,২—

আমার মাঝখান থেকে দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে ছাদে রোদের পিঠে পড়তে বসার কী এক নেশা হল—রাইয়ের লেপ শুকোতে দেওয়ার নেশা হল—বারবার উল্টোতে আসার নেশা হল—গাছে জল দেওয়ার নেশা হল—আমাদের খেলার সময় বারান্দায় আসার নেশা—

পিকলা পড়ল রাইয়ের প্রেমে—কিন্তু রাই তো বেরোয়ই না—একদিন রিফিল কিনতে বেরিয়েছিল—পিকলা পাশে গিয়ে উশখুশ করল কিছুক্ষণ—কিছু হল না—রাই বুঝতেই পারল না—টুয়াদিদি একবার রাইয়ের সঙ্গে কথাও বলল বাড়ি গিয়ে—রাই কোনও উত্তর দিল না—টুয়াদিদি অভিজ্ঞর মতো বলল, চান্স আছে রে পিকলা, রাই তো না বলেনি—আমি বললুম, চান্স নেই—টুয়াদিদি বলল, তুই থাম—পিকলা, তুই রাইদের বাড়ি বল ফেলবি—আনতে গিয়ে রাইয়ের সঙ্গে কথা বলবি—যেমনি কথা, তেমনি কাজ—পিকলা বল আনতে গিয়ে ধরল রাইকে—রাই বলল, তুমি আমার দাদার মতো—জানো না? পিকলা জানত না—আমি জানতাম, আমি জানতাম—

এই যুগ

সেই শীতই আমাদের শেষ ক্রিকেট—

তারপর শচীন-সৌরভ খেলেছে শুধু—সে খেলা দেখেছি—আলোচনা, সবই হয়েছে—কিন্তু নিজেদের আর খেলা হয়নি কখনও—

এখন ক্রিকেট নিয়ে আমি প্রায় সব কিছু জানি—কর্মসূত্রে, ভারতের স্টার ক্রিকেটারদের প্রায় সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে আমার—কপিলদেবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক—জানি, ইডেন আর চিন্নাস্বামী মাঠের গুণগত ফারাক কতটা—কার ড্রেসিংরুম কেমন—এখন জানি, ওটা কর্কেট বল ছিল না—ছিল কর্কের বল—তবু—

আমি ওপাড়ায় থাকি না—জানি না, আর কেউ খ্যালে কিনা—কিন্তু যে পাড়ায় থাকি, সেখানে বাচ্চারা খেলে—টুয়াদিদি, টাবলু, মৌ, পিকলা—তারা খ্যালে, মাঝেমধ্যে আমার বাড়িতে বলও পড়ে—

আমাদের আর খেলার বয়স নেই—অফিসে অফিসে বীরবাঙালি অবশ্য এখনও খ্যালে—কম্পিউটারে—পারলে এসে একদিন দেখে যান না—ক্রিকেটের সাইবার যুগ—

নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

কর্কেট বল

যা অঙ্কের মতো শক্ত ছিল। পাজামার দড়ির মতো টাইট। ঘোঁতনের মতো গামবাট। ভূতের মতো সাদা। পৃথিবীর মতো গোল। শৈশবের মতো সজীব।

কাঁধের কাছ থেকে একটা ঝাঁকুনি নিয়ে সজোরে পড়ত আগুনে ঘাস-পিচে, ব্যাটসম্যানের মালাইচাকি ছিল তার অমোঘ ঠিকানা। বেচারি গদাটা ঘোরাবারও সুযোগ পেত না ঠিকমতো। একটা আর্ত 'আঁউ' শব্দে জমি নিত সচরাচর। মুখ দিয়ে বাছাই চারঅক্ষরী-তিনঅক্ষরী বিড়বিড় করতে করতে খোঁজ চালাত বরফের। বিষটুকু ঢেলে দিয়ে সে তখন ওদিকে ধুলোয়, ডাস্টবিনে নির্বিষ ইনোসেন্ট। যেন কিছুই ঘটেনি, ইল্লি! সে নিমিত্তমাত্র, বোলারের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ভাড়াটে গুন্ডার মতো সে যে পাশের পাড়ার ফোতো কাপ্তানকে জমি ধরিয়ে দিয়েছে, তা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই তার। একটু একটু গড়াচ্ছে, ডানদিক বাঁদিক। পরের দানে কার মাথা লক্ষ্য করে ফের ধেয়ে যাবে সমুখপানে, কার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে ইয়র্ক করে দেবে পায়ের বুড়ো আঙুল, কার বাঁ কনুই-এ কালসিটে-উল্কি এঁকে দেবে গোটা শীতকাল—খোদায় মালুম। ও বলে খেললেও বিপদ আবার না খেললেও বিপদ। খেললে যখন-তখন ককিয়ে ওঠার ভয়, না খেললে পুরুষমানুষ না হওয়ার ভয়। ফলে যতই লাগুক ঠ্যাং-এ, ব্যাটিং জারি থাকবে আলো না-কমা পর্যন্ত...এ দেহে যতক্ষণ আছে প্রাণ...লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান...হেই সামালো হেই সামালো...আঁউউউ...ওরে বাবা, এবারেরটা একেবারে ফার্স্ট পয়েন্টে...

একটা বয়সে আমরা বন্ধুরা সকলেই কর্কেট রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। কর্কেট বল। সাদা রঙের দেখতে। সম্পর্কে ডিউজ-এর সৎভাই। আখরোটের খোলার মতো শক্ত ছিল সে-বলের গা। একটা ম্যাচ পুরনো হলেই সাদা রঙের চোকলা যেত উঠে, মেকআপ খসে তখন নায়িকার আসল কেলেকুষ্টি চেহারা দেখা যেত। সাদা থাকাকালীন বলটাকে অমন নৃশংস মনে হত না, যতটা মনে হত কালো রং-এ। এ হয়তো ঔপনিবেশিক কোনও গ্যাঁড়াকল। কেন কর্কেট বল-ই ছিল আমাদের ফুর্তির মাঠ? সহজ কারণ। ডিউজ বল কেনার পয়সা ছিল না আমাদের। ফড়েপুকুরে এগারো টাকায় যে ডিউস কিনতে পাওয়া যেত, মাত্র এক-দু'টো ম্যাচেই তার সেলাই-টেলাই খুলে একেবারে তুলো বেরিয়ে পড়ত। একান্ন বা একশো এক টাকার ডিউস (হ্যাঁ, দামগুলো সব গিফ্‌ট চেক-এর মতো) কেনার সামর্থ্য ছিল না আমাদের একেবারেই। কিন্তু ব্যাটের সঙ্গে বল-এর ওই 'টুং' শব্দটি চাই। চাই বড়দের মতো ম্যাচ। প্যাড, গ্লাভস, গার্ড। বড়ত্বের একটি অভিজ্ঞান যেমন জাঙিয়া, তেমনই অন্যটি হল শক্তপোক্ত মুগুরছাপ ক্রিকেট।

ডিউসে না হলে কর্কেট। ওটা বল নয়, গোলা। পুরোদস্তুর আঁটোসাঁটো গাম্পুস একটি মাল। সঠিক উড়ে গেলে যা ব্যাটসম্যানের স্থিতি ও ভীতিতে রায়ট লাগিয়ে দেবে। বুকের পাটা থাকলে তবেই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসত যৌবন। কলজের জোর থাকলে হুক করে উড়িয়ে দিত দমকা সাহস। সে খেলার গপ্পো বলতে বলতে টাকরায় স্ট্রোকের শব্দ বেজে ওঠে। উফ্‌ফ...তবে না ক্রিকেট! তবে না কর্কেট।

এমন মর্কট-মার্কা নাম কর্কেট বলের দিল কে? কোত্থেকে তৈরি হল এমন খটমটিয়া? নেট-ঘেঁটে উল্টে-পাল্টে দেখছি, ১৮৫৬-তে আইজাক স্পার্ট নামক এক সাহেব 'ক্রোকে' (Croquet) বলে একটি খেলার নাম নথিবদ্ধ করেছিলেন। ওই খেলাটিতে কাঠের তৈরি বল ব্যবহার করা হত। যার এক-একটির ওজন ডিউস বলের চেয়ে একটু বেশি—ষোলো আউন্স। সাহেবসুবোদের টেনিস খেলার পর, যেমন বাতিল বলগুলো দিব্যি বিক্রি হত টেনিস বল হিসেবে, পরের দিকে ওগুলোই ক্যাম্বিস—তেমনই ওই 'ক্রোকে' বলগুলো, বাঙালি জিভের সুবিধার্থে 'কর্কেট' উপাধি পায়। মূল খেলাটিতে লাল, নীল, কালো, হলুদ, সবুজ, বাদামি, গোলাপি, সাদা—আটরকমের বল ব্যবহার করা হত। পরে, আমাদের কপালে কেবল সাদাটিই এসে



ঠেকে। সাহেবরা চলে গেল, কেবল সাদা রংটি রহিয়া গেল।

যা ছিল ব্রিটিশদের বড়োলোকিপনার বিনোদন, তা আমাদের কুলুঙ্গিতে আসন পাতল। টেনিস বল আমরা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম আগেই, এবার গল্‌ফ গোত্রের খেলাটি থেকেও লোকাল ক্রিকেটের জন্য আমরা 'কর্কেট' বল ছিনতাই করলাম। অমন ভারী ইতিহাস যার, সে বল তো একটু বেশি ভারী হবেই, সাধারণ ক্রিকেট বলের চেয়ে! সে-বলের কামান দাগলে ভয় পাবে না পাড়া-বেপাড়ার বড় বড় পেলু'র দল? রাজারাজরাদের শখের খেলার বল, আমজনতার হল ক্রিকেট-কর্কেট সেজে। গল্‌ফ-এর গরু জাতে উঠল।

বল তো আরও অনেক ছিল। ক্যাম্বিস ছিল, তার টুর্নামেন্টও হত বিস্তর। পিচের কাছাকাছি গিয়ে 'টাই' করলেই টপকে যেত খালপাড়। ছিল রবার ডিউস। দেখতে অনেকটা ডিউসের মতো, ভিতরটা পুরো চাপ রবারে ঠাসা। একবার ড্রপ খাওয়ালে পাক্কা সতেরোবার ড্রপ খেত, মাইরি। রবার ডিউসে ম্যাচ খেলা যেত না। এমন সেগেই বুবকার মতো লাফাত হরবখত—মুশকিল ছিল! একটু বেশিই স্পিন নিয়ে নিত। পিচে খানাখন্দ খোঁদল থাকলে তো তিড়িংবিড়িং ছুটে বলটা হাওয়া হয়ে যেত। সদ্য বড় হওয়া বাচ্চার মতো, কখনও শান্ত হয় না যে মোটে। আর একটা বল ছিল ডাইস-এর। লাল ও খোসকুটে রং-এ পাওয়া যেত। রোজকার পাড়া প্র্যাকটিসে এই বলগুলোর জুড়ি মেলা ভার ছিল। যেমন সুইং, তেমন গ্রিপ। তবে সমস্যা কিছু না কিছু ছিলই। তিনদিন জোরদার খেলা হয়ে গেলেই, বলগুলো গোলাকার থেকে একটু অন্যরকম চেহারার হতে থাকত। আমরা বলতাম,



আলু হয়ে গিয়েছে। বেঢপ হয়ে তার আসল আকার তখন নাসপাতির দিকে। তখন ও-জিনিস আর কোনও কম্মে লাগত না। নতুন বলের খোঁজ করতে হত। কোনও কোনও ডাইস বল অবশ্য তার আগেই ফেটে যেত। জোড়ার জায়গাটা থেকে। ব্যাটসম্যানের কভার ড্রাইভ-এ বলের দুই খোলা দু'দিকে উড়ছে, ফিল্ডার কোনটা রুখবে ঠাহর করতে না পেয়ে দিশেহারা—কতবার এমন দেখেছি। কখনও আবার নুনজল বেরিয়ে যেত বলের। তার মানে বল গন। টায়ারের হাওয়া বেরিয়ে গেলে যেমন হয় আর কি! আমাদেরও সেদিনকার মতো রিটায়ার করে ফেলতে হত!

কর্কেট ফেটে যাওয়ার ঝামেলা নেই। কোনও নটবর এক শটে ভেঙে দিয়েছে বলেও তো শুনিনি। তাই ও-জিনিস একপিস কিনলে বহুক্কাল চলত। ম্যাচের পর ম্যাচ। বহু আঘাত সয়েও কর্কেটের অক্ষয়অমর পরমায়ু ছিল। নেহাত ক্ষয়ে-টয়ে গেলে তখন সিঁড়ির নীচে ঠেলে দেওয়া হত, কয়েকটাকে পেপারওয়েট-এর কাজেও লাগানো যেত, দিব্যি।

গলি ক্রিকেটে কখনও কর্কেট ব্যবহার হত না। এমনিতেই রাশিকৃত নালিশ, এ বাড়ির ডালে বল তো ও বাড়ির শার্সি ঝনঝন—এর ওপর যদি ওই কাঠের গোলক কারুর মাথা ফাটিয়ে দিত, তা হলে পুলিশ কেস নিশ্চিত ছিল। তাই ডিউজের মতোই রয়্যাল কৌলিন্য ছিল কর্কেটের। খেলা হবে তো, শুধু মাঠেই। বিকেলবেলা পার্কে বাচ্চারা টলমল করে, বুড়ো মানুষরা জাবর কাটে—ফলে ওই সময় কর্কেট, এক্কেরে না। ফলে খেলা যা হওয়ার হত, কাকভোরে। আলো ফোটার আগে গোয়াবাগান পার্কে জড়ো হয়ে যেতে হত। তাড়াতাড়ি যেতে হত, নইলে জায়গা পাওয়া যাবে না। অন্য অন্য গ্রুপ এসে সেরা পিচটা নিয়ে নেবে। তাই অমন তাড়া। শীতের সময়ে ভোর-ভোর ওঠা যে কী মর্মন্তুদ, ভয়াল ব্যাপার—তা প্রত্যেকেই কখনও না কখনও টের পেয়েছে। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতাম মটকা মেরে, রাস্তায় বন্ধুবান্ধবদের হইহল্লায় প্রথম দানে সাড়াই দিতাম না। তারপর হয়তো বাবার বকুনিতে একটু নড়তাম চড়তাম। একবার ঝটাকসে উঠে পড়তে পারলাম তো পারলাম, নইলে উইকেটে আবার ঠুকঠুক।

মুখে চোখে জল দিতেও দারুণ টেনশন হত শীতের ভোরে। উরে বাপরে বাপ! কী কনকনানি সব জমা হয়ে ছিল লেপের অন্দরে। একবার বুক ঠুকে পথে নামতে পারলে কিন্তু অত শীত আর লাগত না। তখন ব্যাট-উইকেট-প্যাড-গ্লাভস নিয়ে পুরো হাল্লা চলেছে যুদ্ধে।

ঠিক যে সময়টায়, আমরা পার্কে ঢুকে উইকেট পুঁততে শুরু করতাম, তখন ভাল করে আলোও ফোটেনি। কুয়াশা জমে আছে মাঠের আনাচেকানাচে। ব্যাড লাইট-এর আপিল করলে খেলা ভেস্তা হয়ে যায়, এমন কন্ডিশন। তারই মধ্যে আমরা ফিল্ডিং সাজিয়ে চালু করে দিতাম কর্কেটক্রান্তি। ঘন কুয়াশার মধ্যে থেকে বোলার বল ছুড়ে দিচ্ছে, ব্যাটসম্যান 'জয় মা কালী পাঁঠা বলি' ব্যাট চালাচ্ছে—ফিল্ডার কোথায় বল, কোথায় বাউন্ডারি, বুঝতে না পেরে তালকানার মতো দৌড়ে মরছে—এ ছিল আমাদের রোজকার ক্রিকেটের দৃশ্য। শিশিরে ভিজে কর্কেট বলগুলো পিচ্ছিল হয়ে যেত, বোলাররা ভাল গ্রিপ পেত না। অনেক সময়ই হাত ফসকে বল বেরিয়ে যেত। ব্যাটসম্যানরা ওইসময় পুরো ভিভিয়ান রিচার্ডস। রামপ্যাদান প্যাদাত। একটু পরে রোদ উঠলে সব শুকনো, খটখট। তখন বোলাররা শুরু করত আসল গুগলি। একটু জোরে, শুধু পায়ের কাছে বলটা ফেলত। পা বাঁচাবে না ডিফেন্স করবে—এই দোনামোনায় কত বাঘা ব্যাটারুকে উইকেট বিসর্জন দিতে দেখেছি।

আর দেখেছি ভীতুরাম ফিল্ডারদের। তার মধ্যে আমিও পড়তাম অবশ্যই। যার যার গায়ের জোর ভীষণরকমের, তার শট-এ কেউ হাত ছোঁয়াতাম না। এমনিই জোরে আসা কর্কেট বল দু'হাতে ধরলে বেশ লাগত। তালু লাল হতে যেত। কখনওসখনও হাত ফেটেও যেত। তবে? দরকার কী ওই মেল ট্রেন ধরে! একটা চার হয়ে গেলে পৃথিবীর কোনও অনর্থ হবে না। গালাগাল দিত বোলাররা। মদন একটা, ধরতে পারলে না বলটা! স্মার্ট ফিল্ডারের জবাব, লাইন কই? বাউন্ডারি লাইন? কীভাবে বুঝব এটা বাউন্ডারি হতে যাচ্ছে? এ একেবারে অকাট্য যুক্তি। গোয়াবাগান পার্কটা এতই বড়, আর বেখাপ্পা রকমের আয়ত যে একদম মাঝখানে না খেললে কখনই বাউন্ডারি বোঝা সম্ভব নয়। ফলে বোলার-ফিল্ডার গোলযোগ জারি থাকত। আসল দ্বৈরথ ছিল ব্যাটসম্যান আর বোলারের। ফিল্ডাররা অত মনোযোগী ছিল না কাজে, তখনকার ইন্ডিয়া টিম-এর মতোই। জন্টি রোডস-ও আসেননি, ফিল্ডিংও জাতে ওঠেনি।

আমরা একটা বড় মাঠে প্রায় তিনটি গ্রুপ খেলতাম। প্রতিটি দলে প্রায় সাতজন-আটজন করে খেলোয়াড়। তিনটি টিম যখন ফিল্ডিং দিচ্ছে, কম করে হলেও মাঠে তখন একুশটি ফিল্ডার। ফলে মাঝেমধ্যেই খুব বিপত্তি ঘটত। অন্য ম্যাচের টিম হয়তো ফিল্ডিং করে বসল আমাদের টিমের নিশ্চিত বাউন্ডারি। এর ক্যাচও ধরে ফেলত খপ করে। এসব নিয়ে মাঠে গণ্ডগোল বাঁধত। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সেদিনকার মর্নিং শো শেষ হত।

এ বেলতলায় বেল ছিল না। আম্পায়ারেরও কিছু করার ছিল না, কখনও কখনও আম্পায়ারও না। আমাদের অদ্ভুত ক্রিকেট ছিল অমনটাই। উইকেট থাকত, কিন্তু বেল থাকত না। প্যাড-গ্লাভস থাকত কিন্তু কম পরিমাণে। ফলে সবার জুটত না সব কিছু। সাধারণত, প্রত্যেক ব্যাটসম্যান একটি করে প্যাড ও গ্লাভস পেত। বাঁ পায়ে, বাঁ হাতে পরতে হত সেটি। ডানহাতি ব্যাটসম্যানের ওই দিকটিই সামনে পড়ে। তেমন ইনসুইং যদি বাঁ পা ভেদ করে ডান পায়ে এসে ভিড়ত, তা হলে শীতের ভোরে ব্যাটসম্যান নিশ্চিত শয্যা নিত। কর্কেট বল-এ খেললে গার্ড-টি পরতেই হত। যৌবনসরসী নীড়ে অনিবার্য বিপর্যয় ঠেকানোর ক্ষেত্রে সেটির ভূমিকা এলাকার নাইটগার্ডের চেয়ে কিছু কম ছিল না।

এক পায়ে প্যাড পরে সিঙ্গল নেওয়াটা একটা আর্ট ছিল। কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা লেংচে উল্টো এন্ড-এ পৌঁছতে হত পড়িমড়ি করে। দু'পায়ে ওজনের ভারসাম্যে কোনও তালমিল থাকত না, ফলে ব্যাটসম্যান রান নিচ্ছে না ট্যাঙ্গো নাচছে—বোঝা ভার ছিল। গ্লাভস-এর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। অনেকসময়ই বল এসে অরক্ষিত ডান হাতের আঙুলে ছোবল দিত। মুহূর্তে অনেকের নখ নীল হয়ে যেত, কত বন্ধুর নখ কমপ্লিট পচে গেল এই করে। এমন অসৌজন্য হামেশাই দেখাত কর্কেট। অনেক বেপরোয়া প্লেয়ার ছিল, যারা চটি পরেই মাঠে নেমে পড়ত। অকুতোভয় সব বাঘা ব্যাট। গ্লাভস-প্যাড আর স্যান্ডাকের কম্বিনেশনে ছত্রিশ রানের উজ্জ্বল ইনিংস খেলে দিত ভোর-ভোর।

কর্কেট বলের গতিপ্রকৃতি ছিল নীচ। বল বেশি লাফাত না। বল পড়ে নিচু হয়ে আসত। দু-একজন বোলার ছিল জেফ টমসন-এর মানের। তারা বাউন্সার-বিমার দিতে পারত। এদেরকে কেউই ফেস করতে চাইত না। সিঙ্গল নিয়ে স্ট্রাইক দিয়ে দিত। এই সব মারাত্মক বোলার যত না উইকেট নিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়েছে চোয়াল, থুতনি, কনুই, দাঁতের পাটি। ওরে একচোখো ভগবান, শীতসকালে এত ক্রিকেট দিলি ফ্রি-তে, কেবল টেটাল বর্মখানি ভুলে গেলি দিতে?

গলির ক্রিকেট থেকে পাড়ার পার্কে উত্থান—এই ছিল আমাদের বড় হওয়ার দিকচিহ্ন। কর্কেট আমাদের সাহস জুগিয়েছিল, নতুন অ্যাডভেঞ্চারে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ডাইসের বল, ক্যাম্বিস বল পেরিয়ে আমাদের প্রোমোশন হয়েছিল কর্কেট-এ। সকালের ম্যাচটা অল্প ঝুলিয়ে সারাদিন ধরে গা-হাত-পা নিশপিশ করত। ইস, ওই ক্যাচটা কী করে মিস করলাম, এ হে, ওই রানটা ছিল না একেবারেই—এই সব বিড়বিড়াতাম



শয়নে-স্বপনে। আয়নার সামনে চলত শ্যাডো প্র্যাকটিস। হাতটা কতখানি ঘুরবে কাঁধের ওপর থেকে, আউটসুইংগারের গ্রিপ-টা আদতে কেমন, স্ট্রেট ড্রাইভ-এ ব্যাটের সঙ্গে কনুই কী পজিশনে থাকবে—সারাদিন টুকটাক চলছে সারাক্ষণ। হাত ঘোরাতে গিয়ে হয়তো বাবার দাড়ি কামানোর ব্রাশ হিটকে দিলাম বারান্দায়, হুক করতে গিয়ে হয়তো মেরে বসলাম বোনকেই—বিলক্ষণ গণ্ডগোল বেঁধে যেত ভেতরবাড়িতে। ও-সব চেঁচামেচিতে তেমন কান দিতাম না। বরং কালকের ম্যাচে মিড উইকেট দিয়ে উড়িয়ে দেব কাকে, তা নিয়েই একাকী মশগুল আমি। মাঝেমধ্যে একটু বিরক্তিসূচক শব্দও প্রকাশ করতাম চুকচুক করে। এই বাড়ির লোকজন না, ক্রিকেটটা একদম বোঝে না। দূর। না পারল একটা প্রতিভাকে সম্মান দিতে, না দিল একটা হাততালি! বাইশ গজ পেলে যে আমারও প্রবল দিগ্‌গজ হওয়া—কেউ ঠেকাতে পারত না, সে সেন্টিমেন্ট (ইতি গজ) আর কে বোঝে বস!

শীতকাল তখন শীতকালেই আসত। চাদর বিছাত জমাট কুয়াশাপ্রাচীর, মুখ থেকে হাঃ করলেই ভসভস করে বেরিয়ে আসত ধোঁয়া, খেজুর রসের কলসি নিয়ে পাড়া বেড়াত ফিরিওলা, মাংকি টুপি ভোরবেলার ময়দানে ছেয়ে থাকত আকছার, সন্ধের গলিপথ আরও একটু বেশিই মলিন লাগত ঠান্ডায়। একশো পাওয়ারের বালবের নীচে, কানঢাকা টুপিতে রাস্তার মোড় ক্যারমবোর্ড পাতত, কানাগলি হলে ব্যাডমিন্টন। কমলালেবুর কোয়ারা মিষ্টি হত খুব, নাগপুর হোক বা দার্জিলিং, খাওয়ার শেষে আঙুল চিপে খোসার রস ছিটিয়ে দেওয়া হত বন্ধুর চোখে, যতই জ্বালা করুক, আমরা বলতাম, ওতে চোখ পরিষ্কার হয়। বিবর্ণ দেওয়ালে জ্বলজ্বল করত, দ্য গ্রেট জেমিনি সার্কাস। হাতি, বাঘ, সিংহের চেয়ে ট্রাপিজের শ্বেতবসনাদের ছবি কিছু কম উত্তেজনা ছড়াত না।

নরম রোদে পিঠ পেতে দাঁড়িয়ে ছিল শীতসকাল। আর সব বন্ধুদের শীতের ছুটি পড়ে যেত দুদ্দাড়িয়ে। পিকনিক-পিকনিক জোরসে হর্ন বাজিয়ে উধাও হত ঠাসা ম্যাটাডোর। চলন্ত মাইকে গান বাজত...তোফা তোফা তোফা তোফা...। এই শিরশিরানি মাসের উপহার নিয়ে আসত সান্তাক্লজ। লাল মোজার ভেতর সারা পৃথিবীর জলতরঙ্গ। শীতকালে আমাদের বন্ধুদের মোজায় দুর্গন্ধ হত খুব। কেবল সান্তার মোজা রোজ কাচা, সুগন্ধে ভরা। আমাদের তখন লালজোব্বা দাদুর উপহার পাওয়ার দিন চলে গিয়েছে। কিন্তু শীতকালের চিত্রনাট্যে এইসব সাজানো থাকত খুব। দারুণ লাগত শীতকাল কাটাতে। কলা-কমলা-কর্কেট-এর রোদ পোয়াতে।

শীতকালের দিনগুলোয় আমরা রোজ চান করতাম না। কিন্তু আমরা রোজ কর্কেট করতাম। বন্ধুরা একজোট হয়ে। কাঁধে হাত রেখে। এর ওর সোয়েটারে হাত ঘষতে ঘষতে। বল করার আগে কপিলদেবের কায়দায় ফুলপ্যান্টে বল ঘষতাম। ওপর নীচ। যেমন টেলিভিশনে দেখায়, তেমন। তারপর রান আপ মাপতাম। পুরো ইমরান খান। আঠারো পা রান আপ। শেষমেশ ঠান্ডা হাওয়া ঠেলে অতর্কিত দৌড়। ছুটতে ছুটতে ভেসে যাচ্ছি কাঁধের ডানায় ভর দিয়ে, বল ছোড়ার ঠিক আগের মুহূর্তটায় শেষ চাড়টা দিচ্ছি পেছনদিকে, তারপর একটু উড়ে একটু দূরে কোন মহাশূন্যে বলটা ছুড়ে দিতাম, বল পেরিয়ে যেত নানান রঙিন স্টেশন...ব্যাটসম্যান নাগাল পেত না তার, উইকেটকিপার ধরবে কী, তার তো গ্লাভসই নেই...সব বাধা টপকে বল টিকিট কাটছে অন্য ট্রেনের...তারপর সে হারিয়ে যাবে তার মতো। যেমনটা হয়। বল না-খুঁজে পাওয়ার কারণে খেলা সেদিনকার মতো ভেস্তে যাবে। ম্যাচ শেষ।

যা পাজামার দড়ির মতো লম্বা আর লম্বা। যা পৃথিবীর মতো আদৌ গোলমেলে নয়। যা যৌতনের মতো একবগ্গা, একটেরে। যা অঙ্কের মতো না-মেলা এক সাদা পাতা। যা গলার কাছটায় আজও কর্কেট বল জমে থাকার মতো টাইট ও টনটন।

তা দিয়ে আর টিম-এ ঢোকা যায়, ক্যাপ্টেন?

ইচ্ছে বিরক্তি রাগ, বেফাঁস কিছু কথা

একটা সময় ছিল যখন সিনেমা হল-এ মূল ছবি দেখানোর আগে ফিল্মস ডিভিশনের তোলা তথ্যচিত্র দেখানো হত। সংবাদভিত্তিক সেই সব তথ্যচিত্র দেখতে মানুষ খুব আগ্রহী ছিলেন এমন বলা যায় না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ছবি যেই পর্দায় ভেসে উঠত, তখনই হলের নীচের তলার প্রথম দিকের দর্শকরা তীব্র চিৎকার করতেন। জওহরলাল নেহরুর ক্ষেত্রেও ওই আওয়াজ উঠত। বলা বাহুল্য সেই আওয়াজ সমর্থনের নয়। বোঝাই যেত ওই সব দর্শক পর্দায় ওঁদের দেখতে চাইছেন না। কোনও একটি বিশেষ ছবির বিশেষ শো-এর দর্শক নয়, ষাট-বাষট্টিতে প্রায় সব হলেই এক ঘটনা ঘটত। বাঙালি নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তের একাংশ ওই আচরণ কেন করতেন সে-আলোচনায় যাব না, কিন্তু সরল সত্য হল সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে মতভেদ এবং দেশবিভাগের কারণে জাতির জনককে বাঙালি কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে এই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

কেউ কেউ বলেন, বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় রাজনৈতিক নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। বাঙালির ঘরে-ঘরে সুভাষচন্দ্রের ছবি টাঙানো থাকে, আর কোনও নেতার নয়। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দল তৈরি করলেও তাঁর সম্পর্কে আকর্ষণ কমেনি। পরবর্তীকালে দেশকে স্বাধীন করতে তাঁর যে ভূমিকা, তা বাঙালিকে গর্বিত করেছে। মনে রাখতে হবে সেসময় ব্রিটিশ শাসন ছিল। এখনকার মতো সুভাষচন্দ্র ময়দানে সভা ডেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্রিত করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর আবেগ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বিধানচন্দ্র রায়কে পশ্চিমবাংলার রূপকার বলা হয়ে থাকে। এই নিপাট ডাক্তার ভদ্রলোক পশ্চিমবাংলার উন্নতির জন্যে যেসব পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তার কথা আজও মানুষ বলেন। কিন্তু বিধানচন্দ্র কি জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন? তাঁর সময়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলন তীব্র হয়েছিল। পূর্ব বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুরা যে-সমস্যা তৈরি করেছিলেন তাকে সামলানো সহজ ছিল না। বিধানচন্দ্র শ্রদ্ধেয় নেতা, কিন্তু জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠতে পারেননি। বিধানচন্দ্র তাঁর ভোটারদের সমর্থন প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন, সামান্য ভোটে জেতাই তার প্রমাণ।

বিধানচন্দ্রের পর জ্যোতি বসুর নাম উঠবেই। যখন বিরোধী নেতা ছিলেন তখন তাঁর বক্তৃতা শুনতে মানুষ খুবই আগ্রহী ছিল। সেই সময় কমিউনিস্টদের সভা ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের সাজানো আবহাওয়ায় তৈরি। যে-গান তাঁরা গাইতেন তা ভারতবর্ষের মানুষের অপরিচিত। জ্যোতি বসুর বক্তৃতা শেষ হলেই সভা ভেঙে যেত। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তর চেয়ে জ্যোতি বসু যে ছেলেমানুষি করেছিলেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ তৈরি করতে হয়েছিল, তা বাঙালি ভাল মনে নেয়নি। নকশাল আন্দোলন যতই মানুষের বিরক্তি তৈরি করুক, জনসভায় জ্যোতি বসু যখন ঘোষণা করেন, তাঁর হাতে পুলিশ থাকলে একদিনে নকশালীদের ঠান্ডা করে দিতেন, তখন বাঙালি একজন ডিক্টেটরের ছায়া দেখতে পেয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর যখন তিনি বানতলায় নারীনিগ্রহ এবং হত্যার কথা শুনে নির্বিকারে বলেছেন, 'এমন তো কতই হয়'—তখন বাঙালি চমকে উঠেছিল। জনপ্রিয়তা হারাতে হারাতে যখন স্বাস্থ্যের অজুহাতে দল তাঁকে সরিয়ে দিল, তখন বাঙালি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বিধানচন্দ্র রায় এবং জ্যোতি বসু কখনওই সেই জায়গায় পৌঁছননি যেখানে বাঙালি তাঁদের সুভাষচন্দ্রের পাশে স্থান দিতে পারে। গত বাষট্টি বছরে বাঙালি কোনও রাজনৈতিক নেতার কথায় যে এই বাংলার মানুষ আলোড়িত হয়নি, তা আর বলা যাচ্ছে না।

পৃথিবীর আর কোনও গণতান্ত্রিক দেশে এরকম ঘটনা ঘটেছে কি না আমার জানা নেই। যে কোনও দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে সংগঠিত রাজনৈতিক দল। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একটি বিশেষ মতবাদ থাকে যা তারা সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে অবহিত করে। যাঁরা ভোট দেবেন তাঁরা সেই মতবাদকে যাচাই করে ভোট দেন। প্রতিটি দলের চেষ্টা থাকে সংগঠন মজবুত করতে। ওপর থেকে নীচতলা পর্যন্ত সেই সংগঠনের একটি সংবিধান থাকে। দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি, বিদেশনীতি এবং মানুষের জীবনযাত্রা সুস্থ রাখতে সেই দল তাদের পরিকল্পনা পেশ করে। এইভাবেই মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়। এবং এই সব রাজনৈতিক দল যে মতবাদে বিশ্বাস করে, নিজেদের কাজকর্ম এবং আচরণে তাকেই অনুসরণ



করতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কংগ্রেস গান্ধীকে সামনে রেখে এগিয়েছে। কাজে কতটা একনিষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ মানুষ পেয়েছে। কমিউনিস্ট দলগুলো মূলত মার্কসকে অবলম্বন করে, পরে লেনিন-স্তালিন অথবা মাও সে তুং-কে অবলম্বন করতে চাইলেও অক্ষম হয়েছে। কিন্তু ওপরে ওপরে এই আচ্ছাদন তৈরি করতে চেষ্টা করেছিল।

স্বাধীন দেশে সম্পূর্ণ ব্যক্তি-উদ্যোগে দেশের মানুষকে একত্রিত করার প্রয়াস আমি অন্তত পশ্চিমবাংলা ছাড়া কোথাও দেখতে পাইনি। ব্যাপারটা একদিনে সম্ভব হয়নি। একটি মানুষ, যাঁর পিছনে কোনও সংগঠিত দল নেই, যিনি সততা এবং আবেগ নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন, তাঁকে প্রথমদিকে অনেক প্রশ্ন এবং সন্দেহের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিদেশি শক্তি নয়, দেশের রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে লড়াই কখনওই একা করা সম্ভব নয়। ছেষট্টি সালে কেউ যদি বলত কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে সরে যাবে এবং পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীরা ক্ষমতা দখল করবে তা হলে তাকে উন্মাদ বলা হত। সাতষট্টিতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যখন নির্বাচনে জিতে গঠন করা হল তখন সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ওইসময় ক্ষমতায় আসবেন বলে অনেক গোঁড়া কমিউনিস্টও ভাবতে পারেননি।

একটু পেছন দিকে তাকালে এই অবিশ্বাসটা মাত্রা পাবে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্য সোমেন মিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমেনবাবু জিতলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পরে দল ছাড়লেন। এদেশের বড় দল থেকে বেরিয়ে গেলে হারিয়ে যাওয়ার অনেক উদাহরণ আছে। সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া কেউ নিজেকে নতুন চেহারায় তুলে ধরতে পারেননি। অজয় মুখার্জি বাংলা কংগ্রেস করেছিলেন, শেষপর্যন্ত দল ভেঙে গিয়েছিল। প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং প্রিয় দাশমুন্সী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে দল তৈরি করে বা অন্য দলে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। সৈফুদ্দিন চৌধুরীরা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হিমসিম খাচ্ছেন। এইরকম অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল যখন তৈরি করলেন তখন অনেকের মনে হয়েছিল ওই দলের আয়ু বেশিদিন হবে না। একজন মহিলা, যিনি দারিদ্রসীমার কাছাকাছি বাস করেন, যাঁর পোশাকে আটপৌরে বাঙালিয়ানা, যাঁর বুকে শুধু মানুষের কাছে পৌঁছবার জন্যে আর্তি, তিনি একা কী করবেন? কী করতে পারেন? তাঁকে লড়তে হবে বামফ্রন্ট অথবা অত্যন্ত সংগঠিত দল সিপিএম-এর বিরুদ্ধে যাদের অনুগামীরা মনে করে একই আদর্শে তারা সংঘবদ্ধ, যারা ক্ষমতায় থাকায় সমস্ত সুবিধে পাচ্ছে। সেইসঙ্গে তাঁকে বিরোধিতা করতে হবে কংগ্রেসের, যারা দলত্যাগের কারণে তাঁকে কিছুতেই মাথা তুলতে দেবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কেউ এই লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখতে চাইতেন কি না আমার সন্দেহ আছে।

যুদ্ধ কখনওই একা করা যায় না। পিছন দিকে তাকালে দেখা যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গী হিসেবে যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের মানুষ চিনত না। সৌগত রায় বা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা সুব্রত মুখোপাধ্যায়রা দল ছেড়ে তাঁর পাশে এসেও ভয় পেয়ে ফিরে গেছেন মূল দলে। এই আয়ারাম গয়ারামদের নিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। পরবর্তীকালে সৌগত রায় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ফিরে এসেছেন কিন্তু নেত্রীর ইমেজের পাশে তাঁদের লিলিপুট বলেই মনে হয়েছে। পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় গোড়ার দিকে মমতাকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। তিনি কেন অবসর নিয়েছেন জানি না। অর্থাৎ একদল অদক্ষ, নবীন সঙ্গী নিয়ে মমতাকে এগোতে হয়েছে। বৈষ্ণবরা যেমন কথায় কথায় কৃষ্ণনাম জপ করেন তেমনি এঁরা মমতা ছাড়া কথা বলতে পারেন না। তাই এত বছরে এঁরা মমতা নামক বৃহৎ বৃক্ষের পরগাছা হয়ে রইলেন, আলাদা করে মাটিতে শেকড় নামিয়ে দলটাকে মজবুত করতে পারলেন না।

বিস্ময় লাগে, এ-সব সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে দলটাকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারলেন যা বামফ্রন্টকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে গতবারের নির্বাচিত বামফ্রন্ট এমএলএ এক আড্ডায় সোজাসুজি বললেন, 'সামনের বার দল যদি আমাকে দাঁড়াতে বলে তা হলে দু'বার ভাবতে হবে। ভোটে দাঁড়িয়ে গোহারা হারার লজ্জা পেতে চাই না।'

লোকসভা নির্বাচনের পর এই যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা একদিনে হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শুরু করেছিলেন, তখন কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল, তৃণমূল তার পরে। একের পর এক নির্বাচনে তাঁর দল হেরেছে, কেউ কেউ জিতেছেন। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়েও মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে হেরেছিলেন কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তৃণমূল তৈরি হওয়ার পর মানুষ তাঁকে হারতে দেননি। গত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দলের বিপর্যয় হয় কংগ্রেসের সঙ্গে ভোট ভাগাভাগি হওয়ার কারণে। লোকসভায় জোট বাঁধতে বামফ্রন্টের বত্রিশ বছরের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেল। বাড়িটা এখন হেলে পড়েছে। হয়তো দু'হাজার এগারো পর্যন্ত হেলেই থাকবে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূলই শেষ কথা বলবে।

গোড়ার দিকে তাঁকে গ্রহণ করতে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মানুষের অনীহা ছিল। তিনি বস্তির মেয়ের মতো ঝগড়া করেন, ইচ্ছে করে ছেঁড়া হাওয়াই চটি পরেন, ঝুটো বিদেশি ডিগ্রিকে ঠিক বলে চালাতে চাইছেন, এ-সব কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সততা এবং আবেগ নিয়ে একজন মানুষ একাই একটা দল হয়ে যেতে পারেন এরকম উদাহরণ আর নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কা দিন দিন বাড়ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের একমাত্র অস্ত্র বামফ্রন্টকে আঘাত করা। বত্রিশ-তেত্রিশ বছরে নাজেহাল হওয়া পশ্চিমবাংলার মানুষ এতদিন বিশ্বাসযোগ্য বিকল্পের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরা সমর্থন করছেন বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। মনে রাখতে হবে তৃণমূলের জাগরণ শুধু এই কারণেই। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পারবেন তো মানুষের পাশে দাঁড়াতে? তাঁর দলের কেউ কেউ তো ইতিমধ্যে ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে বিনয় কোঙার, অনিল বসুর ভাষায় কথা বলতে রপ্ত হয়ে গিয়েছেন। তাই ভয় হয়, আমরা এখন গরম তেলে ফুটছি, সামনে জ্বলন্ত আগুন অপেক্ষা করছে না তো!

দলের যাঁরা ওই আগুন জ্বালাতে পারেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তা করা দরকার।



ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টমগর্ভ

বাণী বসু

শুভারম্ভ

বলিতেছি বটে শুভারম্ভ, কীরূপ শুভ এই আরম্ভ তাহা কিন্তু ক্রমশপ্রকাশ্য। বস্তুত এই লেখকও তাহা জানেন না। ইহা যদি সত্যসত্যই দেবদেবীদের বৃত্তান্ত হইত তাহা হইলে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ হইলেও শঙ্খে ফুঁ পাড়িতাম, মধু-কৈটভের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ, জানা কথা বিষ্ণুই জিতিবেন, আমরা তাঁহার পক্ষে আছি জন্মের পূর্ব হইতেই, চণ্ডিকার সহিত সংগ্রাম মহিষাসুরের, তাহাতে পরাজিত অসুরটি যাহার সহিত আমাদের দেশীয়দের সমূহ মিল তাহার পরাজয় আমরা মহাসমারোহে উৎসব করিয়া পালন করি, যুদ্ধ হউক, মৃত্যু হউক, ম্যাসাকার হউক, সকলই মঙ্গলের জন্য হইতেছে, অসুরগুলো দস্যু, অশুভ শক্তি, উহারা যন্ত্রণা পাক, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হউক, অভিমন্যু-বধ হউক আমরা টুঁ করিব না, কারণ শাস্ত্রগুলো বলিয়া দিয়াছে উহারা মন্দ। বহু ক্ষেত্রে কিন্তু উহারা শিবভক্ত (যথা রাবণ), কৃষ্ণভক্ত (যথা শঙ্খচূড়), এবং অনেক সময়েই প্রজারঞ্জক, সৎ, পূজা-অর্চনাও করিয়া থাকে (যথা—বলি), সকলেই কিছু হিরণ্যকশিপু নয়, কিন্তু তাহারা অসুর, দেবতাদের বিপরীত পক্ষ, তাহারা হউক আধিদৈবিক, হউক প্রতীকী, তাহাদের সর্বনাশ সমুৎপন্ন হউক।

মনুষ্য লেভেলে নামিয়া আসিলেই আমাদের বিচার, দৃষ্টিভঙ্গি সকলই পাল্টাইয়া যায়। মানবজগৎ বড়ই জটিল। মানবের সুখ-দুঃখের হিসাব, ভাল-মন্দের মানদণ্ড অত সহজ নহে। তাই, ওপরের লেভেলে পুরাণ লেখা হয়, মনুষ্যে উপন্যাস লেখে। উপন্যাস মনুষ্য চরিত্র, তাহাতে নানা বর্ণছায়ের খেলা, তাহার জীবনের চলনপথ এই সকল লইয়া ব্যাপৃত হইয়া থাকে। মহা আনন্দে, কেননা ইহা সোজা সরল নয়। উপরন্তু ইহা সত্য অথচ সর্বাংশে সত্য নয়, বিস্তর বানানো-বিনানো আছে, তাহাতেই মজা, ছিল রুমাল হইয়া গেল বিড়াল। ক-এর বাবার সঙ্গে গ-এর জ্যাঠামশাইকে চালিয়া চালিয়া চালনিতে মিশানো হইল, কিছু রং চড়িল, কিছু রং ওয়শ করিয়ে করিয়া ফিকা হইল, আরও কতক অদ্ভুত রাসায়নিক পরিবর্তন হইল, উপন্যাসের পিতা দুগগি তৈয়ার হইলেন।

দুগগি ছিলেন, বেশ ছিলেন, সেজোমা নামে ভালমানুষ বিমাতা এবং কৃতী পিতার দুগগি-পুত্র, খোকাবাবুটি। কিন্তু চিরকাল তাহা থাকা যায় না। পরিতাপের কথা দুগগি বেশ কিছুকাল দুগগা ডাক্তার, দুগগাবাবু, দুর্গাপ্রসাদ সিংহ হইয়াছেন। ইদানীং ভদ্রলোক খিটখিটে হইয়া গিয়াছেন। মেজাজ কোনওদিনই অনিন্দনীয় ছিল না। পিতা ও দিদির সহিত অনবরত লাগিত। পিতা গিয়া, সেজমা চলিয়া গিয়া তিনি কতকটা অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। প্রতিপক্ষ নাই, লড়াই জমে না। দিদি ম্রিয়মাণ। পত্নীর সহিত তাঁহার কোনওদিন লাগে নাই। এমন নহে যে পত্নী বিনা প্রতিবাদে তাঁহার আনুগত্য মানিয়া চলেন। ব্যাপার আরও ঘোরালো। তিনি অত্যন্ত সুগৃহিণী, যাহা পান তাহা দিয়াই সংসার তরণীটিকে দুর্যোগেও সচল রাখিতে জানেন। নালিশ নাই। চাহিদা নাই। জ্যেষ্ঠ ইন্দ্র ইদানীং টাকা পাঠাইতেছে। স্কলারশিপের দরুন তাহার পড়ার খরচ তো লাগিলই না, উপরন্তু স্কুল-পাঠ্য বই লিখিয়া সে ছাত্রকালেই বেশ কিছু উপার্জন করিয়া লইয়াছে। বিজ্ঞানের ইন্দ্র-লিখিত বইগুলো তাহার এক উদার অধ্যাপক নিজ নামে বাহির করিলেন, তাঁহার যশ বাড়িল, কিন্তু তিনি রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের অর্ধেক ছাত্রকেই দেন। এ রূপ উদারতা দুর্লভ, কিন্তু তবু লোকচক্ষুর আড়ালে ইহার অস্তিত্ব রহিয়াই গিয়াছে। উপস্থিত ইন্দ্র কানপুরেই চাকুরি করিতেছে, কখনও পিতা কখনও মাতার নামে টাকা পাঠায়। দেখুন সকল পিতাই তো চাহিবেন পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া উপার্জন করিবে, কৃতী হইবে, সংসার প্রতিপালনে অংশ লইবে, ধীরে ধীরে পিতাকে অব্যাহতি দিবে। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ কিছু উদ্ভট। তিনি সর্বদা যন্ত্রণাদায়ক ভাবে সচেতন থাকেন যে ফ্যামিলিটি তাঁহার। এতগুলো সন্তানের জন্মের কারণ তিনিই। স্ত্রীর প্রবল আপত্তি ও যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া নিজের কামটি তিনি ষোল আনা মিটাইয়াছেন। ফলে প্রতিবারই স্ত্রী অসহ্য কষ্ট পাইয়াছেন। কষ্টটিকে প্রকৃতির বিধান বলিয়া যখন মানিয়া লইতেন, তখন এমনকী তাঁহার পিতাও তাঁহাকে ধিক্কার দিয়াছেন।

'আমার তিনটি স্ত্রী (প্রথমাটিকে গঙ্গায় কুমিরে টানিয়া লয়), কিন্তু সন্তান দুইটি মাত্র, তোমার একটি স্ত্রী, অথচ সন্তানসংখ্যা দশ—ইহার মধ্যে আমি কোনও বাহাদুরি খুঁজিয়া পাইনা দুগগি, বিজ্ঞান যে কিছু শিখিয়াছ তাহাও মনে হয় না।' এখন সেই সকল পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া বহুপ্রসবিনী স্ত্রীর শিথিল দেহ ও ক্লান্ত মুখশ্রীর দিকে আড়ে আড়ে চান, অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যান। শেষবারে তেমজ প্রসব করিয়া দেবহূতি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সন্তানধারণক্ষমতা ভাগ্যক্রমে শেষ হইয়া গিয়াছে।

এই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব, সন্তানদের লালনপালন, শিক্ষা, বিবাহাদি সকলই তাঁহার, তাঁহার একার কর্তব্য সুতরাং। যতদিন পিতা ছিলেন সে সংসার অনেকটাই টানিয়া গিয়াছেন। এখন কন্যাগুলোর বিবাহ দিতে গেলে সেই সঞ্চয়ই ভরসা, তাহার ওপরে আবার ইন্দ্র টাকা পাঠাইতেছে। পত্নী সুখী, সন্তানরা গর্বিত, কিন্তু তিনি নিজের কাছে ছোট হইয়া যাইতেছেন। পসারটি পিতার ন্যায় জমিল না, অথচ এখনও তাঁহার ধন্বন্তরি-যশ চালু আছে। পিতা বলিতেন—ওরে মূর্খ, রুগিকে আসিতে দে, উহার পিছনে ছুটিস না, তুই সমাজসেবার ভার লোস নাই, তুই ডাক্তার। দূরে থাকিবি, আন্তরিকভাবে চিকিৎসা করিবি, কঠোর হাতে পাওনা আদায় করিবি। তিনি আন্তরিকভাবে চিকিৎসাটি ছাড়া আর কোনওটাই করিতে পারিলেন না। রুগির আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নটি তাঁহাকে বরাবর পীড়া দিত। কত রুগির যে ফি ছাড়িয়া দেন,



কতজনের কাছে যে ঔষধের দামটুকু পর্যন্ত লন না, কতজনকে পথ্য পর্যন্ত কিনিয়া দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করিতেছেন সেই সকল রোগী মনে করে তাহাদের রোগগুলো আপনি সারিয়াছে। দুগগি ডাক্তারের ঔষধ কথা কয় না আরও কিছু! তিনটি তো পুরিয়া, ছয়খানি করিয়া তো মিষ্টগুলি, লোকটি তাই বিনা পয়সায় ঔষধ দিতে দ্বিধা করে না। যাহাদের যত দয়া করিয়াছেন, তাহারা তত বিদ্বিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেন, তিনি ইহা বুঝিতে পারেন না, তবে পিতার উইজ্‌ডমের প্রতি তাঁহার আস্থা জন্মিয়াছে। তিনি যদি রুগির কনস্টিটুশনের খবর রাখেন, পিতা রাখিতেন মানব সাইকোলজির খবর। অনিচ্ছুকভাবে এ কথা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন, নিজের কাছে। ঘুণাক্ষরেও আর কারও কাছে স্বীকার করিবার কথা তিনি ভাবিতে পারেন না। পত্নীকে বলি বলি করিয়াও বলেন নাই। তাঁহার ডাক্তারি প্রতিভা, তাঁহার দেশপ্রেম, তাঁহার পরোপকারিতা সারা জীবন এই অনুপমা মহিলার শ্রদ্ধা জাগাইয়াছে। সকল কষ্ট তিনি মানিয়া লইয়াছেন, আজ যদি স্বামীর উইজ্‌ডমের প্রতি আস্থা হারান, তো তিনিই বা কোন ভূমিতে দাঁড়াইবেন? বলা বাহুল্য, তাঁহার ইগোও অপরাধ-স্বীকারে বাধা হইয়া রহিল।

কিন্তু পত্নীর সম্পর্কে তাঁহার দুশ্চিন্তার প্রকৃতপক্ষে কোনও কারণ ছিল না। তিনি যাহা ভাবিতেন দেবহূতি তাহার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী। স্বামীর উইজ্‌ডমের প্রতি তাঁহার কস্মিনকালেও আস্থা ছিল না। তিনি তাঁহার মতো করিয়া বুঝিতেন এ এক বিভ্রান্ত মনুষ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিবেন না সন্ন্যাসী হইয়া জীবনতত্ত্ব সন্ধান করিবেন, সমাজসেবা করিবেন না টাকা করিবেন ঠিক করিতে পারেন না। আদর্শ ও দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি মিলিয়া ইনি একপ্রকার জগাখিচুড়ি। তিনি এই দুগগিকেই

ভালবাসিতেন। এ অবশ্য অতীতকালের পতিপ্রেম-জাতীয় কিছু নয়, বর্তমান কালের রোমান্টিক বা যৌন প্রেমও নয়, ইহা কিছুটা সংস্কার, কিন্তু অনেকটাই তাঁহার স্বভাব-পরিশীলিত মন, উদার হৃদয় ও স্বভাবগত উইজ্‌ডমের ফল। ইহার সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। ইহা একরকম ব্যাখ্যাতীত।

এই সময়ে, বাস্তববুদ্ধিহীন, অচিরাচরিত প্রকৃতির দুর্গাপ্রসাদ পত্নীকে একটি প্র্যাকটিকাল বিষয়ে কথা বলিয়া হতবুদ্ধি করিয়া দিলেন।

—বড় দুইটি কন্যার তো এবার বিবাহ দিতে হয়!

দেবহূতি শিহরিয়া উঠিয়া কেমন উদভ্রান্তের মতো বলিয়া উঠিলেন—না, না,

—সে কী! উহাদের কি বিবাহের বয়স হয় নাই? ছাড়িতে কি আমারই ইচ্ছা করে?

এতক্ষণে দেবহূতি সামলাইয়া লইয়াছেন। বলা ভাল, উদ্বেগ আবেগ সব এক ঢোঁকে গিলিয়া লইয়াছেন।

তাঁহার কেমন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল কন্যারা সব বিদুষী গার্গী, লীলাবতী হইবে, উহাদের বিবাহের প্রয়োজন হইবে না। বিবাহ মানে কী? দশটি সন্তানের জন্মযন্ত্রণা তো তিনি ভুলিয়াও ভোলেন নাই। সন্তানগুলিকে প্রাণাধিক ভালবাসেন, কিন্তু তাহাদের জন্মগুলিকে তো ভালবাসিতে পারেন না! তিনি তো চিরকাল জ্ঞান ও বিদ্যাকেই মুক্তি ও পরমার্থ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন। সেই যে ডফ স্কুলে ক্লাস সিক্স অবধি মিস নর্টনের কাছে শিক্ষালাভের সময়টুকু! আহা, তিনি তো সে সুখ ভুলিতে পারেন না। মিস নর্টন তাঁহাকে এককুচি মাত্র আপেল দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জীবনভর তৃষ্ণা, যাহা পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার মধ্য দিয়া তিনি পুরাইতে চান। স্বামী সহবাসের প্রাথমিক রোমাঞ্চ প্রথম সন্তান জন্মিবার পর হইতেই একটু একটু করিয়া উবিয়া গিয়াছে। সর্বদা তিনি ভয়ে কাঁটা হইয়া থাকিতেন, দুই বৎসর পরপর যম-যন্ত্রণা আবির্ভূত হইত। সে সময়ে তাঁহার স্থির ধারণা ছিল ইহা পাপ, নিঃসন্দেহে পাপ, নহিলে এত শাস্তি কেন? পুরুষও পাপ করিয়া থাকে, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে পাপ তাহাতে অর্শে না। নারীকেই ইহা বহন করিতে হয়। আদি-মানবী ইভ আদি-মানব আদমকে নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের আপেল খাওয়াইয়াছিল বলিয়া নাকি ইহা নারীজাতির প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ। তিনি ভাবিয়া পান না, যেজন্য পুরস্কার কবুল করিবার কথা তাহার জন্য তিরস্কার কী করিয়া প্রাপ্য হইল! এইরূপ হবুচন্দ্রের আস্তারেই কি মানবজাতি বাস করিতেছে? ভাবিয়াই তিনি মনে মনে জিভ কাটেন, আবার কিছু অভিশাপ না নামিয়া আসে!

প্রাণাধিক কন্যাগুলিকেও এই একই যন্ত্রণার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া তিনি উহাদের বিবাহ ইচ্ছা করিতেন না। বলিতে কী প্রতিটি কন্যা রজস্বলা হইত আর তাঁহার পরাণ কাঁপিত। বিবাহের কথা তিনি ভ্রমেও কখনও উচ্চারণ করিতেন না। তৃতীয়া শ্রদ্ধা যে তাঁহাদের পালিত পুলকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল, ইহাতে তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও একটা ভরসা ছিল, উহারা পরস্পরের মন জানিয়াছে, ভালবাসার আকৃতিই উহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবে। প্রেম, শুধু গার্হস্থ্য নয়, শুধু শয্যা ও রান্নাঘর নয়। অন্য কন্যাগুলিও যদি এইভাবে নির্বাচন সারিয়া লয়, তিনি স্বস্তি পাইবেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি যুবক তাঁহার নির্মল, নিষ্পাপ কন্যাগুলিকে—নাঃ, তিনি ভাবিতে পারিতেছেন না।



এককেজনের বাস্তববুদ্ধিহীনতা এককে প্রকার। দুর্গাপ্রসাদের এক, তাঁহার পত্নীর আরেক।

জ্যেষ্ঠা ঋদ্ধি গবেষণা শুরু করিয়াছে। স্কলারশিপ পাইতেছে। আর কী চাই? এই ভাবে কন্যাগুলি স্বাবলম্বী হউক। কিন্তু প্রাণের আশঙ্কার কথা স্বামীর কাছে কী করিয়া উচ্চারণ করিবেন? এই ব্যক্তিই তো যত নষ্টের গোড়া! সুতরাং তিনি আমতা-আমতা করিতে থাকেন, এবং ঊর্ধ্বস্থ হবুচন্দ্রের ইচ্ছায় ঋদ্ধির বিবাহ স্থির হইয়া যায়। দুর্গাপ্রসাদ এ বিবাহ দিবেনই দিবেন। কেননা পাত্রটি তাঁহার হিরো-গুরু-মেন্টর সুভাষচন্দ্র বসুর মায়ের সইয়ের বকুলফুলের কেহ। পাত্রটি যাচিয়া আসিয়াছে। কোথাও ঋদ্ধিকে দেখিয়া থাকিবে। সুপুরুষ, সুশিক্ষিত, পিতৃসম্পত্তিও আছে, পিতামাতা বহাল তবিয়তে জীবিত, পাত্রটি সরকারি কর্ম করে। তাহার পিতামাতাও এ সম্বন্ধে আগ্রহী। আরও সুখের কথা ইহাদের দাবি নাই, পাঁচাত্তরখানি নমস্কারী লাগিবে এইমাত্র।

—আসবাবপত্র দিয়া আমাদের



বিব্রত করিবেন না মশায়। আমার পুত্রের ঠাকুরদার কারুকার্যময় পালঙ্ক আলমারি রহিয়াছে, সুন্দর ও বহুমূল্য। বিবাহের জন্য পালিশ হইতেছে।

দুর্গাপ্রসাদ ইহা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। দেবহূতি ক্ষীণস্বরে পাত্রটির সঙ্গে নিজে সকন্যা পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন। যদি...যদি...মরুভূমিতে মরুদ্যানের দেখা মিলে। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ সহসা অতি রক্ষণশীল হইয়া উঠিলেন—ও সব মেমসাহেবি কেতার কথা তুমি ভাবিলে কী করিয়া?

কথায় আছে 'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে'। ভাল কথা। জন্মের ওপর শিশুর হাত নাই। পিতা-মাতা যন্ত্র বটেন, কিন্তু সন্তান কেমন হইবে জানা তাঁহাদের কর্ম নয়। পণ্ডিতের পুত্র, অথচ গাঁজা-ভাং খাইয়া জীবন কাটাইয়া দিল, খর্ব-খর্বী পিতা-মাতার সন্তান অথচ দৈর্ঘ্যে তালগাছ, কালোর ঘরে গোরা, গোরার ঘরে নিকষ কালো, এ অনেক হয়। মৃত্যুর ওপরও মানুষের হাত নাই। সারাজীবন সংযমে রহিলেন, দুরারোগ্য কর্কট রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শেষ হইলেন, সদানন্দ জীবনমুখী সুখী মানুষটি, হঠাৎ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক, ছেলেমানুষ খেলাধূলা করে, থাকে বারোতলায়, মালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় দুই তিন দিনের মধ্যে শেষ! বৃদ্ধ, রোগজীর্ণ, পাগলছাগল হাবাগোবাগুলো গেলে তাহাদের হাড় জুড়াইত, কিন্তু বিধাতা তাহা ইচ্ছা করেন নাই, কেন তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু বিবাহ-বিষয়ে বিধাতাকে দোষ দিলে চলিবে না। আমরা জামাতার পিতার ঐশ্বর্য-কৃতিত্ব দেখিয়া, বংশগৌরব ইত্যাদি দেখিয়া বিবাহ দিই। কন্যা কালো, পণের অর্থে তাহা পুরাইয়া দিয়া মনে করি মেয়ে সুখী হইবে। ধনীলোক দরিদ্রের ঘর হইতে বধূ আনে, সে পায়ের তলায় থাকিবে, আবার কেহ টাকার পুঁটুলি-সহ বধূ আনে। সংসারের সুসার হইবে বৈবাহিকের পয়সায়। বলি—সকলগুলোই কি মারাত্মক ভুল নয়? বিবাহ তো পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত, নয়? সেই সঙ্গে মনোবৃত্তিগুলোও যাচাই করিয়া লওয়া প্রয়োজন। মুখে তো গলিতং বিগলিতং, কিন্তু ভাবী কুটুম্বরা সত্য সত্য কী প্রত্যাশা লইয়া আসিয়াছেন? মুখে তো বলিতেছেন—আপুনি যাহা যাহা দিয়াছেন অতি উত্তম মহাশয়, কিন্তু সবার ওপরে উত্তমস্য উত্তম আপনকার কন্যাটি। ধন্য হইলাম। আপনার আদরিণী কন্যাটিকে লইয়া গিয়া অতঃপর ভাতে মারিলেন, কাপড়ে মারিলেন, দাসীর অধিক খাটাইলেন, জামাতাটি আবার ক্রোধী, আহা কী করিবে একটু রাগ করিয়াছে বই তো নয়! গলা টিপিতে গিয়াছে? অ্যাল!! কী করা যাইবে? স্ত্রিয়ং ভাগ্যং, পুরুষস্য মেজাজম! গঙ্গার ঘাটে মেয়ে পছন্দ করিল, মাসিতুতো, বোনের বিবাহবাসরে মেয়ের হিল্লে হইল, কলেজ-ফাংশনে মেয়ের দশটি সম্বন্ধ। গলিয়া জল হইলেন। যাচিয়া আসিয়াছে? আর কী! তলাইয়া দেখিলেন না দু'টি পরিবার ভিন্ন, অভ্যাস, কালচার, স্বভাব ভিন্ন, মানুষ দু'টিও ভিন্ন। বরটির যেমন চাহিদা আছে, বধূটিরও তেমন আছে। দু'জনে কি পরস্পরের প্রত্যাশা পুরাইতে সচেষ্ট হইবে? এ সকল কেহ ভাবে না। একটা ঘোরের মধ্যে বিবাহ হইয়া যায়।

পাত্র আপাতদৃষ্টিতে স্বাস্থ্যবান, দেখিতে ভাল, পাশ দিয়াছে সাড়ে তিনটা, কাজকর্ম ভালই করে এবং যাচিয়া আসিয়াছে, যাচিয়া, যাচিয়া...। এবং লতায়-পাতায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে।

সমুদ্র হইতে এক ঘটি জল তুলিলে, তাহাকে ফুটাইয়া একচিমটি লবণ বাহির করিয়া নিলে, তস্মিন জলে সন্নিধিং কুরু বলিয়া কলের জল কুয়ার জল তাহাতে ঢালিলে তারপর তাহাতে চারটি তুলসীপত্র দিয়া পূজা করিলে, সমুদ্রের সহিত সেই জলের যে সম্পর্ক, ইহাই তাহা। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ নাচিয়া উঠিলেন। ঋদ্ধির বিবাহের রসুনচৌকিও বাজিয়া উঠিল।

(ক্রমশ)

ছবি : ঈশীনা বণিক

র‍্যান্ডম, যায়িচ্ছে, ভাবনা লোফালুফি

আমাদের বাড়িতে একটা বেড়াল ছিল, তার ইঁদুর ধরার তরিকা ছিল সম্মোহক। প্রবল চালাক, দুরন্ত খেলুড়ে এবং আত্মবিশ্বাসী পেশিময়, তবু সে নিতান্ত হীনবল ইঁদুরকে কক্ষনও এক থাবড়ায় নিকেশ করত না। কক্ষনও না। গোড়ায় একবার দৌড়ে গিয়ে চাপড়াত, প্রায় আদরের ভঙ্গিতে। ইঁদুর ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাত, তখন ক্ষিপ্র তাড়া, এবং আরেকটা বড় চাপড়। তারপর বেশ বড় ইন্টারভ্যাল। ইঁদুর পড়ে ছটফট করছে, আকুল এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, বেড়াল বেশ দূরে সরে দাঁড়িয়ে পুরো ভয়টাকে চাখছে। ইঁদুর কিছুক্ষণ পর বোধহয় ভাবত, আততায়ী অন্য কাজে বেরিয়েছে। বা দৈব অনুগ্রহে সে আজ বেঁচে গেল। ছেঁচড়ে নিজেকে তুলে, আচমকা পাগলের মতো স্প্রিন্ট, যদি সেঁধিয়ে পড়তে পারে, পেয়ে যায় একটা দরজার ফাঁক, আলমারির তলা। এবং সেই মুহূর্তে তিন লাফে তার ঘাড়ে এসে পড়ত বেড়াল, ছোট্ট করে একটু দাঁত বসিয়ে দিত নরম স্বাদু মাংসে, ফের সরে যেত। ইঁদুরের তখন রক্ত গড়াচ্ছে, আর একইসঙ্গে, এই উপলব্ধিও চুঁইয়ে ঢুকছে: সে হারবে আজকে, এই ফাঁদ অনেক বেশি ঘাগু ও পরাক্রান্ত, সে এর ঘাঁতঘোঁত মালুম পাওয়ার আগেই শান-দেওয়া শ্বদাঁত প্রোজেক্ট শেষ করবে। ভয়ে সে শরীর মোচড়ায়, কিচকিচ করে, বেড়াল হঠাৎ অলস পায়ে হেলেদুলে এসে তার পেটটা কামড়ে নাড়ি অল্প ফাঁসিয়ে দিয়ে, ও মা, সত্যিই ঘুরতে বেরিয়ে যায়। পাঁচিল বেয়ে উদাস পায়চারি করে, সামনের মাঠে ঘাসটাস শুঁকে আসে। ফের ঘরে ঢুকে বেশ মন দিয়ে নিচু হয়ে ইঁদুরকে দ্যাখে, আলতো শোঁকে, শীতের জামা রোদ্দুরে দেওয়ার মতো একটু উলটেপালটে দেয়, তারপর অল্প দূরে থাবা মুড়ে বসে চুপটি চেয়ে থাকে। নির্বিকার মুখে মনোযোগী গোঁফ মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে খালি। বহুক্ষণ কেটে যায়, কর্তব্যের ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে বেড়াল মৃদু চাপড় মেরে আসে। ইঁদুর ছটফট করে, তার অনেক অঙ্গই এখন খসে গিয়ে ঝুলছে, নিজের রক্ত ঘেঁটে মেঝেতে সে নিজের হেরো অসহায় আলপনা আঁকছে, মুখে তার ধুলো আর তুমুল শত্রুর কাছে নিঃশেষে হেরে যাওয়ার অপমান, যে তার প্রতিরোধকে এতটাই নুলো ও পলকা সমঝেছে, হনন-প্রক্রিয়াটাকে নিয়ে গেছে একটা খেলার সীমান্তে, যেখানে হত্যাটা বড় কথাই নয়, বড় কথা টুঁটিটাকে নুইয়ে দেওয়া, আর ধামসে বোঝানো: সে যে অ্যাদ্দিন তার মুন্ডু থেকে শিশ্ন অবধি খলবল করতে করতে বেঁচে ছিল, তা নিতান্তই বেড়াল-জাতি তাকে 'বেঁচে থাকা-বেঁচে থাকা' নটিক করতে অ্যালাউ করেছিল বলে।

এবার প্রশ্ন হল, শার্মেন আর্চারি কে? তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা, কানাডা-র অধিবাসী, জামাইকা গিয়েছিলেন চারদিনের জন্য, ঠাকুমার শ্রাদ্ধ অ্যাটেন্ড করতে। ফিরে আসার পর, কানাডা-র অটাওয়া এয়ারপোর্টে নামতে, কাস্টমস তাঁকে আটকায়। আলাদা করে ডেকে নিয়ে যায়। বলে, তাঁকে একটু বেশিই বিশদ সার্চ করা হবে, ড্রাগের জন্য। কেন? তিনটে কারণ। তিনি যাওয়ার টিকিটের কিছু পয়সা মিটিয়েছেন ক্রেডিট কার্ডে, টিকিট কেটেছেন একেবারে শেষ মুহূর্তে, আর জামাইকা দেশটায় গিয়ে চারদিন থেকেই ফিরে এসেছেন। এতেই নাকি তাঁর প্রতি সন্দেহ গাঢ় হচ্ছে, চোরা-পাচারকারীরা ঠিক এইরকমই ব্যবহার করে। প্রায় ঘণ্টাখানেক আতিপাতি করে খুঁজেও কিচ্ছুই যখন পাওয়া গেল না, তখন একটা বিশেষ যন্ত্র বুলিয়ে দেখা শুরু হল তাঁর মানিব্যাগ, সুটকেসের লাইনিং। শেষটা তাঁর টুথব্রাশ-টাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে বলা হল, এই তো, এখানে হেরোইন-এর চিহ্ন আছে। আর সঙ্গে আছে টি এইচ সি, যা মারিহুয়ানা-র একটা উপাদান। শার্মেন স্তম্ভিত। উনি বললেন, আপনারা মিথ্যুক! আমি জীবনে কখনও ড্রাগ নিইনি, আর আমার টুথব্রাশ আমি ছাড়া কেউ ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না, আপনারা ড্রাগটা পাচ্ছেন কোত্থেকে? তা ছাড়া, আপনারা তো সমস্ত কিছু এতক্ষণ ধরে তন্নতন্ন করে দেখলেন, আমি যে লুকিয়ে ড্রাগ আনছি না, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কাস্টমস-এর লোকরা শার্মেনকে বললেন, সেই তো। সন্দেহ মেটাবার জন্য এবার আমরা আপনাকে 'স্ট্রিপ সার্চ' করব। মানে, পুরো নগ্ন করে তল্লাশি। আপনার পায়ুর মধ্যেও উঁকি মারব আমরা। কোনও ছাড় নেই। শার্মেন চিৎকার করে বললেন, 'কী বলছেন আপনারা! আমার স্বামী অবধি জানেন না আমার পায়ুর মধ্যেটা কীরম দেখতে। আপনাদের আমি তা দেখতে দেব কেন!' কাস্টমসের লোকজন নির্বিকার। তারা বলল, আপনার চার বছরের বাচ্চাটাকে বরং আপনার স্বামীর কাছে রেখে দিচ্ছি, ভদ্রলোক আপনাদের নিতে এসেছেন তো। আপনি পাশের ঘরে গিয়ে ল্যাংটো হোন। শার্মেন বললেন, 'কক্ষনও না! আপনারা তা হলে আমায় অ্যারেস্ট করুন! কিছুতেই আমি রাজি হব না।' তখন শার্মেনকে হাতকড়া দিয়ে হাতদু'টো পিছমোড়া করে বাঁধা হল। শার্মেন চেঁচাতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন। কাস্টমস কী আর করে, এয়ারপোর্টে এরকম একটা নাটুকে হল্লাহাটির সিন তো হতে দেওয়া যায় না, তারা শার্মেনকে হিঁচড়ে মেঝের ওপর উপুড় করে শুইয়ে ফেলল, আর একজন হাঁটু দিয়ে তাঁর ঘাড়ে চড়ে বসল। তারপর তারা বোঝাল, এমন করতে থাকলে তারা শার্মেনকে সত্যি সত্যি জেলে তো ভরবেই, বাচ্চাটাকেও দিয়ে দেওয়া হবে চাইল্ড এডস সেন্টার-এ, অতএব, বুদ্ধিমানের কাজ হল, উলঙ্গ হয়ে পড়া। শার্মেনকে তিনজন মহিলা একটা ঘরে নিয়ে গেল, ল্যাংটো হতে আদেশ করল। শার্মেন বিশালদেহী মহিলা, প্রথাগত ভাবে সুন্দর যাকে বলে, তা তিনি একেবারে নন, শরীর নিয়ে এমনিতেই অসম্ভব আড়ষ্ট ও সংকুচিত, এদের সামনে সব পোশাক খুলে তাঁর পৃথুল দেহ উন্মুক্ত করে দাঁড়ালেন। ভাল করে তাঁকে দেখে, ওরা হুকুম করল, বগল তুলুন, ওখানে কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কি না দেখি। শার্মেন তাই করলেন। এবার ওরা বলল, ভারী বুকদু'টো তুলে তুলে দেখান, ওর নীচে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন কি না। দেখানো হল। এবার শার্মেনকে বলা হল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করে সামনের দিকে একেবারে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়তে, যাতে মাথা প্রায় হাঁটু ছোঁয়। তারপর ওরা বলল, নিজের পাছার গালদুটো ধরে ফাঁক করুন, আমরা দেখব, মলদ্বারে কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কি না। শার্মেন তাই করলেন। কাস্টমসের মেয়েরা খুঁটিয়ে তাঁর পায়ুর মধ্যেটা দেখল। দেখা শেষ হলে বলল, একটা পা এগিয়ে দিয়ে বসে পড়ুন, আর কাশুন। দেখি গলার মধ্যে কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কি না। শার্মেন ওইভাবে বসলেন, বেশ ক'বার কাশলেন। তারপর ওরা বলল, এবার উঠে দাঁড়ান, আর ভুঁড়িটা তুলুন, আর পা দু'টোকে যত পারেন ফাঁক করে দিন, তারপর যোনিটা ছড়িয়ে দিন ভাল করে, আমরা দেখি যোনিদ্বারে ড্রাগ ঢোকানো আছে কি না। শার্মেন সেভাবে দাঁড়ালেন। তাঁর যোনির ভেতরটা ওরা খুব ভাল করে দেখল। তারপর বলল, ঠিক আছে, পোশাক পরে নিন। শার্মেন তখন থরথর করে কাঁপছেন, আর কাঁদছেন। ওদের একজন বলল, আপনি কি মিনিটখানেক এই বেঞ্চিটায় বসবেন? দু'জন তাঁর লাগেজগুলো ট্রলি করে দিয়ে গেল শার্মেনের স্বামীর কাছে। একবারও কেউ বলল না, দুঃখিত। কেউ বলল না, সরি ম্যাডাম, আমরা ভুল সন্দেহ করেছিলাম। কিচ্ছু না। নিয়ম আছে, ফলো করা হয়েছে। ব্যস। শার্মেন কাঁপতে কাঁপতে, স্বামী আর ছেলের হাত ধরে, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘটনাটা ঘটেছে এই দিনপঁচিশেক। শার্মেন পুরো ব্যাপারটা বলেছেন সংবাদমাধ্যমের কাছে, কিঞ্চিৎ হইচই চলেছে। কেউ বলেছে, আদিখ্যেতা। বিমানবন্দরের লোকরা স্ট্রিক্ট হয়েছে তো আমাদেরই ভাল-র জন্যে। এইরকম কড়া হলে তবে না বদমাশদের ধরা যাবে? কেউ বলেছে, তাও ভাগ্য, লিয়ন স্টুয়ার্ট-এর মতো অবস্থা হয়নি। লিয়ন একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ, যাঁকে ২০০০ সালের মার্চ-এ এই এয়ারপোর্টেই ঘণ্টা আড়াই সার্চ করেও কিছু না পাওয়া যাওয়ার পর নগ্ন করে তল্লাশি করা হয়েছিল, আর তাতেও কিছু না-পাওয়া যাওয়ার পর, পায়খানা করতে আদেশ করা হয়েছিল (একখণ্ড পায়খানা হলেও চলবে), যাতে বোঝা যায় উনি ড্রাগটা দেহের ভেতরের কোনও প্রত্যঙ্গে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কি না। পায়খানা করে, লিয়ন ছাড়া পেয়েছিলেন। এই নিয়মগুলো কেন যে সমাপতনের চোটে বারবার শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে গিয়ে শুধু কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় বা অন্যান্য কালোকুলো গরিবমার্কা লোকের ঘাড়ে পড়ে, সে প্রশ্ন আলাদা, আমরা চলে যাব বেড়ালের গল্পে।

ক্ষমতার মূল মজা কোথায়? শুধু দমন করা-য়? উঁহু। শুধু কুচুৎ কুচুৎ মুন্ডু কাটতে কার ভাল্লাগে? আসল ঝাঁঝালো কিক-টা আসে অন্যের নিরীহ পাছায় আচমকা লাথি কষানোর আরাম থেকে। মানুষকে খামোকা, অহেতুক অপমান করার ফুর্তি, মুখটাকে নিয়ে 'দেখি ছোস্তমোনু' বলে ইউরিনালের মেঝেতে ঘষটে দেওয়ার আমোদ : এ-ই আসলি আরক। আজকে চ এই শুয়ারটাকে একটু হ্যারাস করি। লোকটা কিছুই করেনি, কিন্তু তার হাসিটা দেখলেই রাগ হচ্ছে, এবার বোর্ডরুমে ডেকে কিছুক্ষণ রগড়ালাম, বিয়েবাড়ি আছে জেনে ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কাজ ধরিয়ে দিয়ে রাত এগারোটা অবধি অফিস খাটালাম, অণ্ডকোষে অল্প বিছুটি ঘষে দিলাম, সবার সামনে বলালাম, 'বাবু, আমি আপনার পিকদানি'—সে জিনিসের মজাই আলাদা। মস্তি প্রকৃত জমাটি, যখন শিকার ও শিকারি, উভয়েই গোড়া থেকে নিশ্চিত : ম্যাচের ফলাফল কী হবে। শিকারকে সই করতে বললে সে নিজেই লিখবে : হেরো। সঙ্গমে আটকে পড়া কুকুর-কুকুরীর যৌনাঙ্গ টিপ করে যে আনন্দে যুবকেরা ইট মারে, সেই নিখাদ নির্ভয় আনন্দই ক্ষমতার আনন্দ। প্রতিরোধ-সম্ভাবনাহীন ও পূর্বনির্ধারিত-উপসংহার-রঞ্জিত।

ক্বাথ ঘোর জমে, যখন এর সঙ্গে মেশানো হয় 'আমার গলায় তো বকলশ নেই' আর 'ওবাবাগো তা হলে এত লাগছে কেন' কনট্রাস্টিং বোধের বিটনুন। দম্ভে দম্ভে, খেলিয়ে খেলিয়ে একটা লোকের বুকের ভেতর ভয়ের মণ্ডটা মোচড়াতে পারলে, কোমরের কাঁচাখেগো তরবারি ধকধকিয়ে ওঠে। আমাদের বেড়ালটা ইঁদুরকে তা-ই করত। আদ্ধেক দিন ইঁদুরটাকে খেতও না।



খাওয়ার জন্য তো মারেনি। সম্পূর্ণ, নিঃশেষে পরাজিত করবে বলে মেরেছে। আনন্দটা ইঁদুরের হেরে যাওয়ায় নয়, সে তো হারবেই, আনন্দটা হল, তাকে এই ছাড়ছি, ওই ধরছি, এই ভাবাচ্ছি সে পার পেয়ে গেল, ওই দেখাচ্ছি তার সুতো আমার হাতেই ধরা, এই মনে করাচ্ছি আমি টর্চার ছেড়ে পাড়া বেড়াতে গেলাম, এবার মৃত্যুটা অন্তত তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ওই তড়িঘড়ি ফিরে জম্পেশ খুবলে দিলাম, তারিয়ে তারিয়ে চুষলাম তার হিলবিল ছটফট। রাষ্ট্রও, ক্ষমতাও, ঠিক ওইভাবেই, আমাদের ন্যাজে সুতো বেঁধে, ছেড়ে রেখেছে। আমরা ভাবছি, বুঝি মৌলিক অধিকার আছে আমাদের। আমরা স্বাধীন নাগরিক, একজন ব্যক্তির প্রাপ্য ন্যূনতম সম্মানটুকু রাষ্ট্র আমাকে দেবে। হাঃ। কোনওদিন কোনও এয়ারপোর্টে যে নেমেছে, দানবীয় কুকুর র‍্যান্ডম শুঁকে গেছে যাকে বারেবার, কোনও রাতে পুলিশ এসে কড়া নেড়েছে যার দরজায়, কথা না বলে তছনছ শুরু করেছে আর বেঁটে মুগুর গুঁতিয়েছে হাঁউমাঁউ-করা মায়ের পেটে, কোনওদিন ভূগোল টিচারের ছোড়া ডাস্টার ঠকাৎ আছড়ে পড়েছে যার কপালে, আর রেক্টর থাইয়ে বেত সাপটাতে সাপটাতে বলেছে বেশ সুন্দর লাল লাল স্ট্রিপ হচ্ছে তো তোর ফর্সা গায়ে, কোনওদিন থানায় ঢুকতে হয়েছে যাকে লোকাল কমিটির ছেলের হাতে মার খেয়ে কমপ্লেন করার জন্য, আর পুলিশ অফিসার ঠান্ডা চোখে জিগ্যেস করেছে ভদ্দরলোকের পুত হয়ে তার এত তেল গজালো কী করে, কোনও হাসপাতালে ডাক্তারদের ঘরের সামনে যাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আধপোড়া বাবাকে মেঝে থেকে বেড-এ দেওয়ার আকুতি জানাতে, আর নার্সরা-ডাক্তাররা চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে যেন সে অদৃশ্য এবং তার আকুল আউআউ আর্জিগুলোও হাওয়ায় ধরছে না—সে-ই জানে, ওসব অধিকার-ফধিকার আসলে কোথাকার চার অক্ষর। এয়ারপোর্টে যখন উদ্ধত প্রহরী এসে কদর্য সুরে 'হোয়, এদিকে' বলে একটি তেরিয়া তুড়ি মেরে অমুক লাইনে দাঁড়াবার হুকুম করবে, আর পেছন সড়সড় করে শুকিয়ে আসবে পা সুড়সুড় করে উঠবে সেই খরখরে থাবড়া তামিল করতে, তখনই বোঝা যাবে, ওসব অধিকার বা নাকের পোঁটা দেখানোর জায়গা আসলে তোমার পাড়ার গলি, বা ক্লাবের ক্যারমবোর্ড, বা বউয়ের বিছানা। এসব ক্ষমতা-জায়গার আবহাওয়াই আলাদা। একটা গন্ধ পাওয়া যায় এখানে, ঝিমঝিমে। ক্ষমতার। ঠান্ডা মেঝে থেকে ভাপ ওঠে, ক্ষমতার। ঢোকামাত্র, অঙ্ক পরীক্ষার মতো, ভেতরটা গুড়গুড় করে, হাত-পা সেঁধিয়ে যায়, মন আপনা থেকেই ফিসফিসিয়ে বলে দেয়, অপমান-টপমান অত গায়ে মেখো না, বেশি টাচি হতে যেও না, বিনয়ে গলে তুতলে সিঁটিয়ে মেনে সায় দিয়ে কোনওমতে বেরিয়ে যাও। হাঁ করতে বললে হাঁ, গান গাইতে বললে গান। বেশি পাকামো মারলে এরা পেছনে রুল ঢুকিয়ে দেবে, এবং তোমায় নিজের হাতে খুলে দিতে হবে সেই পেছন। যত মেরুদণ্ডপনা, এই চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে ফলিও। ফটরফটর অফিসটাইমের বাসে করবে।

ওই ভয়টা ওরা টাকনা দিয়ে দিয়ে চাখে। একটা নোটিস দেখলেই ত্রস্ত হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গিটা ওরা আঁজলা করে করে লোফে। একটা করে পিঠ-চাপড়ান দেয়, আর চকিত অনুপানে তেত্রিশ ল্যাজ-মোচড়ান। আমেরিকা-ইংল্যান্ড যদি ঠিক করে, এবার থেকে আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণির ছবি তুলে তবে দেশে ঢুকতে দেবে, তোমায় নেত্র টাটিয়ে ক্যামেরার দিকে চেয়ে থাকতে হবে, ঘেমো আঙুল টিপ দিয়ে ধ্যাতানি গিলতে হবে। যদি তারা বড় করে লিখে দেয়, এসব আমেরিকান বা ইউরোপীয়দের করতে হবে না, শুধু অন্য জাতগুলোর বেলায় প্রযোজ্য, তোমায় চট করে সেই চাবুকের মতো অপমানটা আকস্মিক থুতুর মতো ঘষে ঘষে গায়ে মিলিয়ে নিতে হবে। কাল যদি আমেরিকা বলে, প্যান্টালুন খুলে যৌনাঙ্গের ছাপ নিয়ে তবে ভিসার আবেদনপত্র বিচার করা হবে, তবে তোমায় সকল গাঁইগুঁই ও ভ্যানতাড়া বাড়ির কুলুঙ্গিতে জমা রেখে, আড়াই সেকেন্ডের মধ্যে বেল্ট খুলে প্যান্ট নামানোয় অভ্যস্ত হতে হবে। আর ধুর আমেরিকা আমেরিকা কেন করছি, কাল যদি দিল্লি বলে সে শহরে ঢুকতে গেলে কাল যদি কলকাতা বলে সে শহরে পুজো দেখতে গেলে কাল যদি কাঁচরাপাড়া বলে সে অঞ্চলে বাড়ি নিতে গেলে কাল যদি অটোওলা বলে সে রুটে অটো চড়তে গেলে মিলিটারি যখন-তখন তল্লাশি নেবে আর চাঁদা যখন-যা-চাইবে দিতে হবে আর মোবাইল খুলে দেখাতে হবে বউয়ের কী ছবি হাসছে আর টিপেটুপে দেখতেও পারে অঙ্গবঙ্গ আর দরকার পড়লে ওঠবোস করাতে পারে হিসি করাতে পারে শিশিতে এবং নাভিতে বেয়নেট ঢুকিয়ে তৈরি করতে পারে দ্বিতীয় নাভি, কী করব আমি-আপনি? আমাদের যত দাপ-ঝাঁপ, যত রবরবা, যত গণতন্ত্র-গণতন্ত্র বাই, সব শৌখিন, ফঙ্গবেনে। শুধু রাষ্ট্র এখনও থাবড়া মারছে না—এই অনুগ্রহে সব আলোকিত। মরীচিকাবিলাসী মানুষ, মনে করে সে সভ্য সমাজের অংশ, পার্টনার, এবং শুধু শুধু তাকে কেউ লাথি মারবে না। যেমন আমরা সবাই ভাবি, আমার অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, হবে খবরের কাগজে নাম বেরনো অন্য লোকেদের। কী সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া দেয়, না? এই তো আমরা পিকনিক যাচ্ছি, এই তো এসএমএস-এ প্রোপোজ করলাম, এই তো একটা চাকরি ছেড়ে ঢুকে পড়লাম অন্য চাকরির মোহনায়। বাঃ, হাত-পা তো তা হলে আমিই নাড়ছি। বাপু, স্বয়ংকে চোখ ঠেরে ঠেরে যে মণি শুকিয়ে গেল মা, স্বাধীনতা বলে যাকে ভাবছিস, তা আসলে শিকারি-র দেওয়া ছাড়, মুখ টিপে ঘুঁতঘুঁত হেসে 'যাক না কদ্দূর যাবে' মর্মে আলগোছে ছুটে ছুটে বেড়াতে দেওয়া। ওই মুক্তির তেজপাতাটা ছড়িয়ে দিলে, খেলার খোশবো খোলে ভাল।

অতএব হে অমৃতস্য গাধাঃ, নীতিকথা শুন : যত হাউশ, যত কেরদানি, মেলার তেলচপচপে পাঁপড়—শুধু ক্ষমতা এখন অলস দুপুরে নৈর্ঋতে তাকিয়ে নখ খুঁটছে বলে। একবার ঘাড়টি সে যথাযথ ঘোরালেই কিন্তু আমায় নিংড়ে উচ্ছেদ হয়ে যেতে হবে আমার বাড়ি থেকে, আমার কাকিমাকে জেনানা-শিবিরে একপিস বাড়তি পাঁউরুটির জন্য কাপড় তুলতে হবে পেট অবধি, গোল হয়ে ঘিরে থাকা লোকের মধ্যিখানে উবু হয়ে আমায় কোঁত পেড়ে প্রসব করতে হবে অকলুষ ন্যাড়, আমার নিজের আজীবন না-দেখা দুর্গন্ধী পায়ুগর্ত মেলে ধরতে হবে ক্ষমতার টর্চ ও কুরুশকাঁটার সামনে। হয়তো কোনও এক বিষ্যুৎবার সকালে, বা মঙ্গল সন্ধেয়, কোনও পুলিশের বা কোনও কাস্টমসের হোমরা-র কোষ্ঠ সাফ হবে না বলে মেজাজ খিঁচড়ে থাকবে, বা রক্ষিতা হ্যাঁ বলেছে বলে মুড টগবগে থাকবে এবং প্রাণ চাইবে আঁকুপাঁকু রগড়, অথবা ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরায় আমার মুখটা দেখেই মনে হবে শালা সিওর মুরগিচোর, আর ব্যস, গড়গড় গড়গড় গড়িয়ে যাবে আমার কোনওমতে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা করতলে আঁকড়ানো পুঁচকে সম্মানের বল, সব বুদ্ধি-স্টেটাস-সংস্কৃতি-আয়নাঅহং, ল্যাংটো হতে হবে অচেনা দামড়া লোকের সামনে, ল্যাংটো, ন্যাংটা, উদোম, আর ঝুলন্ত পুরুষাঙ্গ তুলে দেখাতে হবে অণ্ডকোষে সেলোটেপ দিয়ে আটকে রেখেছি কি না আপত্তিকর আঁচিল, ক্ষমতা মুচড়ে কচলে ডলে ঘেঁটে নেবে, আর আমায় তার ঘা লেই দিয়ে দিয়ে ঢাকতে হবে চিরকাল, রাত্রে ঘুম আসবে না আর সন্তানের কাছ থেকে লুকিয়ে নিতে হবে ওয়াক, আর তারপর আমার বন্ধুরা কিচকিচ করতে করতে ঘুরে বেড়াবে ছুটে বেড়াবে প্রজনন করে বেড়াবে উল্লাসে আর ভাববে এই সকল রৌদ্র তাদেরই জন্য সকল পরিধি তাদের হইহইয়ের নিমিত্ত সকল কল্যাণ তাদের জড়িয়েছে অক্সিজেনের প্রায় আর যে অতিকায় করালদংষ্ট্রা কোমল-রোমযুক্ত জন্তুটি এগিয়ে আসছে সে কোনওদিনই ধরতে পারবে না তাদের, বা ধরতে চায়ও না, তার অন্যান্য জরুরি কাজে যাওয়ার জন্য থাবা চেটে রেডি হয়ে নিচ্ছে এই উজ্জ্বল সকালে।

রো ব বা রে র মে গা

ক্ষমা করো হে প্রভু

রূপক সাহা

সুশোভনদার জরুরি তলবে জয়দেব অপেক্ষা করে মিউজিয়মের সামনে। বহুক্ষণ পেরিয়ে গেলেও সুশোভনদা আসেন না। এদিকে অধৈর্য জয়দেব ফিরে যেতে চায় কলেজ স্ট্রিটেই। এসপ্ল্যানেড স্টেশনে পাতাল রেলের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ধাক্কা লাগে একটি সৌম্যদর্শন যুবকের সঙ্গে। ছেলেটি রেগে না গিয়ে লজ্জিত মুখে ক্ষমা চায়। এরপর মেট্রো ধরে জয়দেব যখন মহাত্মা গান্ধী স্টেশনে পৌঁছায়, হঠাৎ মোবাইলে ফোন আসে সুশোভনদার...।

২

কার্জন পার্কে দলিত পার্টির মিটিং ছিল। বেলা আড়াইটেয় কালীঘাট স্টেশন থেকে পাতাল রেলে চড়ার সময়ও গোরা ভাবতে পারেনি, এসপ্ল্যানেড পৌঁছতে ওর সোয়া চারটে বেজে যাবে। মাত্র ছ'টা তো স্টেশন। বারো মিনিটের বেশি লাগা উচিত ছিল না। কিন্তু ময়দান স্টেশন থেকে ছাড়ার পর, খানিকটা এগিয়েই ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে কে একজন নাকি আত্মহত্যা করেছে। তাই গাড়ি আর এগবে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক কামরায় বসে থেকে গোরা মারাত্মক বিরক্ত। মিটিং-এ বক্তৃতা দেওয়ার কথা দলিত পার্টির নেতা কেশব রামের। উত্তর ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে, ইদানীং উনি খুব নাম করেছেন। এই প্রথম উনি কলকাতায় এলেন। ওঁর বক্তৃতা শোনার খুব ইচ্ছে ছিল গোরার। কিন্তু সব গুবলেট হয়ে গেল ট্রেন বিভ্রাটে।

এসপ্ল্যানেড স্টেশনে নেমেই গোরা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। হঠাৎ ওর সঙ্গে এক ভদ্রলোকের ধাক্কা লেগে গেল। আচমকা ধাক্কা লাগায় ভদ্রলোকের কাঁধ থেকে ব্যাগ ছিটকে পড়েছে। গোরা ভেবেছিল, মাফ চাওয়ার পরও, ভদ্রলোক বোধহয় কটু কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু উনি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উল্টে বললেন, 'এরকম তো হতেই পারে।' সত্যি, জগতে এরকম ভাল মানুষও তা হলে আছেন! অন্য কেউ হলে, যা ইচ্ছে তাই শুনিয়ে দিত।

রাস্তায় বেরিয়ে, ঘরমুখো বাস-মিনিবাস থেকে দলিত কর্মীদের স্লোগান শুনে গোরা বুঝতে পেরে গেল, মিটিং সম্ভবত শেষ হয়ে গিয়েছে। দূর থেকে আসা মানুষজন বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। দেখে ও একটু হতাশই বোধ করল। ইস, বাড়ি থেকে বেলা বারোটার সময় বেরিয়ে এলেই ভাল হত। কাল রাতে পার্টির নেতা অদ্বৈত চ্যাটার্জি বলে দিয়েছিলেন, 'কার্জন পার্কের সমাবেশে প্রচুর লোক হবে। তুমি কিন্তু বেলা একটার মধ্যেই মঞ্চের কাছে পৌঁছে যেও। দেখি, কেশব রামের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি কি না। দেখবে, ওঁর সঙ্গে কথা বলে, তোমার ভাল লাগবে।' কিন্তু সেটা আর আজ সম্ভব হল না। অদ্বৈতবাবু কী ভাবলেন, কে জানে? নিজেকে ও সান্ত্বনা দিতে লাগল। এই যে এত কাছে আসা সত্ত্বেও কেশবজির সঙ্গে ওর দেখা হল না, এর পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে। ঈশ্বর চান না, এখানে ওর সঙ্গে কেশব রামের যোগাযোগ হোক। হয়তো তাঁর মনে অন্য কোনও ইচ্ছে আছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা যখনই ও ভাবে, তখন আর কোনও আফসোস হয় না গোরার। অদ্বৈতবাবুর মুখেই কাল রাতে ও শুনেছে, আগামী মাসে ভুবনেশ্বরে, দলিত পার্টির একটা কর্মী সমাবেশ আছে। ওখানে কেশবজি দু'তিনদিন থাকবেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোরা ভাবল, ভুবনেশ্বরে কেশবজির সঙ্গে ওর দেখা হবেই। কেননা, সমাবেশ সংগঠনের দায়িত্বও হয়তো, ওর ঘাড়েই এসে পড়বে। পার্টির নেতারা জানেন, ভুবনেশ্বর ওর নিজের জায়গা। জন্ম জাজপুরে হলেও, গোরা বড় হয়েছে ভুবনেশ্বরে। মাত্র পাঁচ বছর হল, ও কলকাতায় এসেছে পড়াশোনা করতে। ভুবনেশ্বরে দলিত পার্টির সংগঠনে ও জড়িয়ে পড়েছিল চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স থেকেই। ছুটিছাটায় সময় পেলে, প্রায়ই ও ছুটে যায় ভুবনেশ্বরে।

গোরা এখন পাতাল রেলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ইলেকট্রনিক ঘড়িতে ও দেখল, পৌনে পাঁচটা বাজে। সন্ধে ছ'টার আগে রাসবিহারীতে ফেরার কোনও তাগিদ নেই। কী মনে হওয়ায়, ও কার্জন পার্কের দিকে হাঁটতে লাগল। ফুটপাত দিয়ে হাঁটার উপায় নেই। মেট্রো সিনেমার ভিড়, হকার-ক্রেতা মিলিয়ে যেন হট্টমেলা। তুলনায় রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাতে লোকজন কম। টাইলস বসানো। খুব সুন্দর লাগে দেখতে। ইদানীং ওখানে একটা পার্ক হয়েছে। গাছগাছালি দিয়ে চমৎকার করে সাজানো। কলেজের দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে ওই পার্কে গোরা বার-তিনেক এসেছে। নির্বিঘ্নে হাঁটার জন্য রাস্তা পেরিয়ে ও উল্টোদিকের ফুটপাতে চলে এল।

কিন্তু কয়েক পা হাঁটার পরই, সেই পুরনো উৎপাত। সামনে জটাধারী এক সাধু। হাতজোড় করে ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। পরনে লাল কৌপীন, সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, হাতে


USE M

ত্রিশূল। ফুটপাতের গাছতলায় বসেছিলেন বোধহয়। ওকে দেখে উঠে এসেছেন। সাধুকে দেখে গোরা খুব বিব্রত বোধ করল। বরাবর দেখেছে, কোথাও সাধুসন্ন্যাসীর মুখোমুখি হলে, তাঁরা হাতজোড় করে এসে নতমস্তকে দাঁড়ান। এ অভিজ্ঞতা ওর জীবনে অনেকবার হয়েছে। সাধুটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না। শুধু তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে। না হলে সাধুটি সামনে থেকে নড়বেন না। অনেক সময় লোক জড়ো হয়ে যায়, তামাশা দেখার জন্য। ব্যস্ত রাস্তায় যাতে ফের লোক জড়ো না হয়ে যায়, সেজন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোরা সাধুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল।

তখনই ওর চোখে পড়ল, একজন ফোটোগ্রাফার ছবি তুলছেন। দেখে তাড়াতাড়ি সাধুর মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে, গোরা দক্ষিণমুখে হাঁটতে শুরু করল। এইসব ফোটোগ্রাফারকে ও মোটেই পছন্দ করে না। ও মনে করে, অনুমতি ছাড়া কারও ছবি তোলা অনুচিত। কে কী উদ্দেশ্যে ওর ছবি ব্যবহার করবে, কে জানে? ফোটোগ্রাফারটি ওর ছবি তুলল কেন, এই প্রশ্নটাই ওর মাথায় ঘুরতে লাগল। ও তো সেলিব্রিটি নয় যে, কাগজে ছবি ছাপতে হবে। ও ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র। কলকাতায়, বলতে গেলে খুব অল্পসংখ্যক লোকই ওকে চেনেন। ওকে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।

এক ফোটোগ্রাফারের জন্য মাস কয়েক আগে, গোরা খুব সমস্যায় পড়েছিল। একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির লোকেরা ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছিল। কোথায় যেন ওর ছবি তুলে সেই ফোটোগ্রাফার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কাছে পাঠিয়েছিল। লোকগুলো এসে ধরল, পার্ক হোটেলে একটা গ্ল্যাম হান্ট কম্পিটিশন হচ্ছে। সেখানে ওকে অংশ নিতে হবে। লোকগুলো আরও বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, জিতলে মডেলিং কেরিয়ার নিয়ে ওকে ভাবতে হবে না।

গোরা রাজি হয়নি। ও জানে, সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য ও জন্মায়নি। লোকহিতকর কাজের জন্য ও এই পৃথিবীতে এসেছে। সাধারণ লোকের মঙ্গলের জন্য ও সারা জীবন কাজ করে যাবে। ঈশ্বর সেটাই চান। ছোটবেলা থেকে গোরা সেই ইঙ্গিতই পাচ্ছে। ওর জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ওর নেই। ও ঠিক করেছে, দলিত মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। এখনও সমাজে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষ বলেই বিবেচিত হয় না। সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হলে এদের হাত শক্ত করা দরকার। এই কাজটা একা ও করতে পারবে না। চাই একটা দলীয় সংগঠন। গোরা সেই কারণেই ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে। ও বিশ্বাস করে, দলিতরা একদিন জাগবেই।

ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতেই গোরা একবার পিছন ফিরে তাকাল। দেখল, সাধুটি ফের তাঁর নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়েছেন। ফোটোগ্রাফারটি তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। খুব ছোটবেলায় মা একবার বলে দিয়েছিলেন, সাধুসন্তদের কখনও অসম্মান করবে না। এঁরা ঈশ্বরের দূত। কখনও কখনও নাকি ঈশ্বরই পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সাধুরূপে মানুষের সামনে এসে দাঁড়ান। জাজপুরে হোক অথবা ভুবনেশ্বরে—কখনও কোনও সাধু বাড়িতে এলে, মা তাঁদের ফিরিয়ে দিতেন না। অতিথির মতো ব্যবহার করতেন। জল দিয়ে তাঁদের পা ধুইয়ে দিতেন। তারপর ফলাহারের ব্যবস্থা করতেন। পুরো পরিবারের জন্য আশীর্বাদ চাইতেন। বসে তাঁর কাছে অমৃতবাণী শুনতেন।

মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে, আনমনা হয়েই গোরা কার্জন পার্কের দিকে হাঁটছিল। হঠাৎ শুনল, 'আরে গোরাদা, আপনি? মিটিং-এ ছিলেন নাকি?'

ছেলেটাকে গোরা চিনতে পারল। তরুণ মাজি। দলিত পার্টির এন্টালি ইউনিটের নেতা। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করত। হঠাৎ ওর বাবা মারা যান। বাবার চাকরিটা পেয়ে এখন কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মী। দাঁড়িয়ে পড়ে গোরা জিগ্যেস করল, 'মিটিং কি শেষ হয়ে গিয়েছে?'

তরুণ বলল, 'আরও অনেকক্ষণ চলত। কিন্তু পুলিশ তাড়াতাড়ি শেষ করে দিল। বেলা তিনটের সময় লালবাজার থেকে খবর পাঠাল, আধ ঘন্টার মধ্যে রাস্তা ফাঁকা করে দিতে হবে। লালগড় থেকে বহু মানুষ এসেছেন। তাঁরা নাকি পথ অবরোধ করবেন। এসব শুনে অদ্বৈতবাবু বললেন, মিটিং শেষ করে দাও। তাই অনেকেই বক্তব্য রাখতে পারলেন না। অন্য কোনও পার্টির মিটিং চললে কি পুলিশ এভাবে ফোর্স করতে পারত? বলুন গোরাদা? আমরা দলিত বলেই গা জোয়ারিটা করতে পারল।'

'কীরকম লোক হয়েছিল তরুণ?'

'হাজার কুড়ির মতো হবে। কার্জন পার্কের মতো জায়গায়, বলতে গেলে কিছুই না। মিটিং-টা এত তাড়াহুড়ো করে লিডাররা করলেন, সব জেলায় ঠিকমতো খবরই পৌঁছল না। দেখছেন তো, অন্য পার্টিগুলো আজকাল ফুঁ দিলে লাখখানেক লোক এসে জড়ো হয়। সেই তুলনায় আমাদের মিটিং-টা আজ খুব সাকসেসফুল হল না।'

'তা হলে তো কার্জন পার্কে এখন গিয়ে আর লাভ নেই।'

'এখন ওখানে কেউ নেই গোরাদা। লিডাররা রাজভবনে গিয়েছেন। গভর্নরের কাছে ডেপুটেশনে। কিন্তু আপনি এলেন না কেন? মিটিং চলার সময় তো আপনার নাম করে, অনেকবার মাইকে অ্যানাউন্স করা হল। আমাদের মনে হল, আপনি মিটিং অ্যাভয়েড করার জন্যই আজ আসেননি।'

'না, তেমন কিছু না। আমারই ব্যাডলাক। পাতাল রেলে আটকে গিয়েছিলাম। যাক, কেশব রায়ের বক্তৃতা কেমন শুনলে?'

'সো সো। আমার অন্তত ভাল লাগেনি। ওড়িশার মুভমেন্ট কেমন চলছে, সেটা শুনে আমার লাভ কী? আমরা নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর আর লালগড়ের কথা শুনতে চাই। ওখানকার আন্দোলন যে আসলে দলিত সম্প্রদায়ের...লিডাররা জোর দিয়ে সেটা কেন বলছেন না? মাঝখান থেকে লাভের গুড় অন্য পার্টি খেয়ে যাচ্ছে। টিভিতে ভুলভাল দেখাচ্ছে, কাগজে যা তা লিখছে, লিডাররা কিছু বলবেন না?'

'বলে কী হবে? কাগজ কি ছাপবে?'

'না ছাপুক, অন্তত আমাদের লোকগুলো তো জানতে পারবে। অদ্বৈতবাবুরা এই যে কিছুদিন ধরে নিউ ডেমোক্রেসির কথা বলছেন, সেটা এইসব জায়গায় যদি আমাদের বিশদভাবে না বলেন, তা হলে আমরা বুঝব কী করে? সত্যি বলছি গোরাদা, আমি খুব ডিসাপয়েন্টেড। একটা কথা বলব? অদ্বৈতবাবুদের বয়স হয়ে গিয়েছে। লিডারশিপ দেওয়ার ক্ষমতা ওঁদের নেই। আপনার মতো কেউ এসে যদি হাল ধরেন, তা হলে পার্টির গ্রোথ কেউ আটকাতে পারবে না।'

'এ ধরনের কথা আর কখনও বলো না তরুণ। ঈশ্বর যখন চাইবেন, তখন আপনাআপনিই লিডারশিপ আমার হাতে চলে আসবে। আপাতত, পড়াশোনাটা আমাকে শেষ করতে দাও।'

'কেন বলব না গোরাদা? স্ট্রেটকাট বলছি, আমরা, দলিত পার্টির নিচুতলার কর্মীরা কেউই চাই না, পার্টির লিডারশিপ কোনও ব্রাহ্মণের হাতে থাকুক। অদ্বৈত চ্যাটার্জিকে আমরা কেউ মানতে পারছি না। আমাদের কথা ভেবে মুভমেন্ট-টা উনি শুরু করেছিলেন, ঠিক আছে। তার জন্য ওঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা, আমাদের মধ্যে থেকেই কাউকে নেতা হিসাবে চাই।'

এসব জঙ্গিকথা কানে গেলে অদ্বৈতবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন। প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্য গোরা বলল, 'তুমি কি এখন বাড়ি ফিরে যাবে?'

'না গোরাদা, আমাকে একবার মেডিকেল হাসপাতালে যেতে হবে। সিউড়ি থেকে আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই, আমার কাছে এসেছে। আমাদের পার্টিরই কর্মী। মেডিকেলে ভর্তি আছে। সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড। তাকে একবার দেখতে যাব।'

'ইনজিওর্ড কেন? তার কী হয়েছে তরুণ?'



'যুগ যুগ ধরে যা হয়ে আসছে...। দলিত পার্টির হয়ে কাজ করতে গিয়ে, হার্মাদ বাহিনীর হাতে এমন মার খেয়েছে যে, উঠে দাঁড়াতে পারছে না। স্পাইনাল কর্ডে চোট। হার্মাদরা ওর বোনকে রেপ করেছে। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই শহরে বসে আমরা তেমন টের পাই না। কিন্তু জেলায় জেলায় এই হার্মাদ বাহিনী এমন অত্যাচার চালাচ্ছে, গোরাদা আপনি ভাবতেও পারবেন না।'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল গোরার। দলিত, অনগ্রসর, আদিবাসীদের উত্থান দেশের কোনও বড় পার্টিই পছন্দ করছে না। বিহারে রণবীর সেনারা দমন প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। বাংলায় গড়ে উঠেছে বামপন্থী পার্টির মদতপুষ্ট হার্মাদ বাহিনী। এরা বুঝতে পারছে না, মার খেয়ে দলিত, আদিবাসীরা ক্রমে ক্রমে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। উচ্চবর্ণের মানুষদের আর তারা মানবে না। কয়েকদিন আগে, খবরের কাগজে একটা ছবি দেখে গোরা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এসপ্ল্যানেডের মতো জায়গায় পথ অবরোধ করেছে লালগড় থেকে আসা কিছু মানুষ। এক আদিবাসী মহিলা বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পরনে ডুরে শাড়ি। তাঁর হাতে টানটান তির-ধনুক। মহিলার চোখে বহুদিনের বঞ্চনার আগুন। ফোটোগ্রাফারদের দিকে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন। যেন এখুনি তির জ্যামুক্ত করে দেবেন। ওই মুখে ভয়ের কোনও চিহ্ন নেই। ছবিটা দেখে গোরা একদিকে যেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে আশার আলোও দেখতে পেয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে তরুণকে ও জিগ্যেস করল, 'পুলিশের কাছে কমপ্লেন করেছ?'

'করে কোনও লাভ নেই। ওর মা রিপোর্ট লেখাতে গিয়েছিল, কিন্তু পুলিশ তাকেই আটকে রেখেছে চুরির অপবাদ দিয়ে। দেখি কী হয়। আজ চলি গোরাদা। পরে দেখা হবে।'

তরুণ হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ'র দিকে চলে গেল। ওর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গোরা ফের পাতাল রেলের দিকে এগোতে লাগল। তরুণ বলল বটে, এই শহরে বসে আপনারা তেমন কিছু টের পান না। কিন্তু কাগজ খুললেই আজকাল পাতা জুড়ে দলিত, অন্ত্যজ, আদিবাসীদের নিপীড়নের খবর আকছার দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সংবিধানের সব নাগরিকের জন্য সমানাধিকারের কথা লেখা আছে। কিন্তু দলিতরা এখনও এ দেশে সেই অধিকারের খুব সামান্যই ভোগ করতে পারে। দলিতদের ওপর অত্যাচারের খবর গোরা যখন শোনে, তখন ভীষণ রাগ হয়। আর তখনই গোরার মাথার ভিতরে লাল রঙের কী যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

গভীর লাল সুড়ঙ্গে কে যেন ওকে টেনে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ বুজে ফেলে। তখন চোখের সামনে অজানা কিছু দৃশ্য দেখতে পায়। এটা কোনও অসুখ কি না, তা গোরা জানে না। কাউকে কোনওদিন কিছু বলেওনি। তবে ছোটবেলা থেকেই ওর জীবনে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, প্রতিবারই ও নতুন নতুন দৃশ্য দেখে। কার্জন পার্ক দিয়ে হাঁটার সময় আজ দেখল, কোনও এক প্রাচীন জনপদ দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছে। ওর পিছনে অসংখ্য দলিত শ্রেণির মানুষ, সমস্বরে কী যেন বলতে বলতে যাচ্ছে। তাদের কারও হাতে মৃদঙ্গ, খোল, করতাল। তারা দু'হাত তুলে নাচছে। গোরা প্রাণপণ চেষ্টা করল, সেই আওয়াজ শোনার। কিন্তু শুনতে পেল না। দৃশ্যগুলো মিলিয়ে যাওয়ার পরও গোরা বুঝতে পারল না, কোন জনপদ দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছিল। লোকগুলোই বা ওকে কেন অনুসরণ করছিল? মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর ওই দৃশ্যগুলো ওর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। নিজেকে সামলে ও দেখল, পাতাল রেলের প্রবেশ পথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নীচে নামার জন্য সিঁড়িতে পা দেবে, এমন সময় গোরা শুনতে পেল, 'এক্সকিউজ মি, একটু দাঁড়াবেন প্লিজ। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

মুখ ফিরিয়ে গোরা দেখল, সেই ফোটোগ্রাফার। একটু আগে যে ওর ছবি তুলেছিল। কড়া কথা বলবে বলে ও ঘুরে দাঁড়াল।

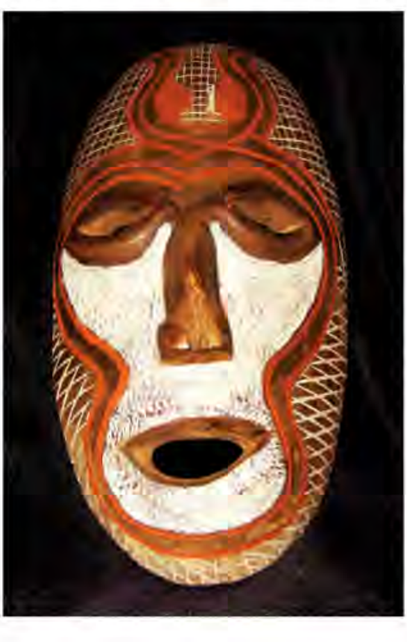
পরের এপিসোড আগামী রোববার
অলংকরণ শান্তনু দে

শুরু হল নতুন কলাম। চেনা, আধচেনা মানুষের মুখ, মুখের মিছিল

সাতষট্টি সাল। রানাঘাট টাউনের রেল বাজারের মোড়ের পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে। খর্বকায়, মাথায় খোঁচা চুল। ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরা। আর লম্বা ঝুল বাংলা শার্ট, কলার দেওয়া। লোকটির ডান-পাশে, বাঁ-পাশে দু'টো বড় বাজারের ঝোলা লাগিয়ে রাখা—কিন্তু ঝোলার ফাঁক দিয়ে আনাজপাতি উঁকি মারছে না। অবশ্য, একবারে অত কি লক্ষ করেছি খুঁটিয়ে? করিনি। করেছি, পরের বার ফেরার সময়ে। কোথা থেকে ফেরার সময়? বাজার থেকে। এইটে পড়ি তখন। বাজারে যাই ডিম কিনতে, কলা কিনতে, খবরকাগজ কিনতে, আর তখন স্কুল বন্ধ। বড়দিন উপলক্ষে ২৫ তারিখ থেকে ছুটি। ২ তারিখ খুলবে। ততদিন ছাড়া গরু। খোঁটা পোঁতা নেই।

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, ডান হাতটি সামনে ছড়ানো। করতল পেতে রাখা। আর করতলে একটি দেশলাই বাক্স শায়িত। লোকটি একদৃষ্টিতে করতলের দেশলাইয়ের দিকে তাকিয়ে। মাঝে মাঝে ধমক দিচ্ছে, 'ওঠ, ওঠ বলছি! কী হল? শুনতে পাচ্ছিস না?' জগতে কেউ তার দিকে ফিরেও দেখছে না। জগৎ অবশ্য তখন ফাঁকাই থাকত। লোকের ভিড় খুব সকালে স্টেশনবাজারের দিকে দেখা গেলেও রাস্তা একটু ফাঁকা-ফাঁকাই। পাশেই মেথরপট্টি। সেখান থেকে দু'টো বাচ্চা এসে সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল মুখে দিয়ে তাকিয়ে। দু'জনের মধ্যে একজনের আবার, শরৎচন্দ্রের কথা ধার করলে, 'পরণে ঘুনসি ব্যতীত কিছুই নাই।'

চলে গেলাম ভোগলাদার দোকানে, এদিক-ওদিক ঘুরে, শটিলকক কিনে যখন ফিরছি, মিউনিসিপ্যালিটির সামনে গোল একটা ভিড়। আর মাঝে মাঝে তা থেকে একটা গর্জন। কী হচ্ছে ওখানে! ভিড় ঘেঁষে উঁকি মারলাম। সেই লোকটি। কথা বলছে।



তার গম্ভীর গলায়। আর কী আশ্চর্য সেইসব কথা : 'মাটি ফেটে রক্তো উঠছে। মা-আ-টি-ই ফেটে রক্তো! মা কামিকখ্যা ঋতুমতী হইসেন। ধরিত্রীর রক্তো। রক্তো বোসুনধরা-আ। কেউ দেখতে পায় না, শুধু সাধক দেখতে পায়। সা-আ-ধ-অ-ক! কে দেখতে পায়! কে দেখতে পায়? বলো সব।' ভিড় গুঞ্জরণ করল, 'সা-ধ-ক।'

'হ্যাঁ-অ্যাঁ অ্যাঁ। সাধক। সেই রক্তোমিতৃতিকা তিলমাত্তর তিলমাত্তর করে নিয়ে মাদুলিতে পোরা হয়েসে। মানষের উবগারের জন্য। কে পুরেছে মিতৃতিকা! মাদুলিতে কে পুরেসে! বল-অ-অঃ!' ভিড় বলল, 'আপনি, আপনি!' 'মারব এক থাবড়া! অমনি আমি? আ-মিই! সা-ধ-অ-ক পুরেসেন। আমি মায়ের সেবাইত। মা কামিকখ্যার সেবাইত! মা কামিকখ্যা ঋতুমতী হলি, তকন, আমার ডাক পড়ে। সা-আধক আমারে রক্তোমিতৃতিকা পোরা মাদুলি দেন। মানষের উবগার করতে। কী উবগার? কী উবগার? বল-অঃ?' ভিড় বলল, 'কী উবগার?'

'মানষের কতরকম বিপদ। রাতে বাড়ি ফিরবেন, পিছনে ছপছপ ছপছপ। ঘুরে তাকালেন। কেউ নেই। রোজই হচ্ছে। কে পিছু ধরেসে। তারে দেখতে পান না। বিপদ নম্বর এক। দুই, যা খান হজম হয় না। চেক্ ওঠে। ঢেউ, ঢেউউ। জোয়ান খান, হজমি খান, বিফল। বি-ই-ফ-অ-ল। রাতে বউয়ের বুকে ওঠেন আর নেমে পড়েন। কাজের কাজ হয় না। এই উঠলেন তো? বলতে বলতেই ব্যস। বিফ-অ-ল। বি-ই-ফ-অ-ল। বিপদ নম্বর তিন, নেবার। নে-এ-এবার। ইংরাজি কথা। পাড়াপড়শি। পাশের বাড়ি। তিন ফুট ছেড়ে ডেরেন কেটেছে কী কাটেনি! নরদোমা। মামলা। সাত বচ্ছর। মিটছে না। ছেলের বয়স পাঁচ হয়ে গেল এখনও বিছনায় মুতছে। যত বকো। শোনে না। মুত হয়ে যায়। কী করা যায়। বিপদ নম্বর চার। বউ রাতবিরেতে ছাদে ঘুরে বেড়ায়। উঠোনে দাঁড়ায়। খুব ভোরে দেখলেন নেই। কী হল গো, কোথায় গেলে গো? এই তো। কই? না, বিষ্টি দেখছি। ঘোর উঠোনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে ভরা বউ। হ্যাঁ, ভরা বউ! বিপদ নম্বর পাঁচ। পুকুরে চান করতে নামলেন, ধাতু বেরিয়ে গেল। জল লাগলেই ব্যস। সকালে পাতোক্কিত্তে বসলেন, কোঁত পেড়েছেন কী, ধাতু বেরিয়ে গেল। শরীল শুকিয়ে যাচ্ছে। লিকলিকে হ্যাংলা হয়ে যাচ্ছেন গিয়ে। অত ধাতুক্ষয় হলে হবে না! কত বিপদ মানুষের। কত বিপদ! উদ্ধার কীসে? কীসে উদ্ধার? ব-ল-অ-অঃ?' আবার হুঙ্কার, 'ব-অ-ল-অঃ!' ভিড় বলল, 'কীসে উদ্ধার?'

'বলছি বলছি। এই মা কামিকখ্যার মাদুলি, হাতে বাঁধবেন। নিজের ডাঁয়ে বাঁধবেন, বউয়ের বাঁয়ে। বাচ্চাদের কোমরে ঝুলিয়ে দিন। মা কামিকখ্যা! তাঁর দয়া। উদ্ধার। উ-দ্-ধা-আ-র!'

এবার ঝোলার ভেতর থেকে একমুঠো মাদুলি বার করল লোকটি। 'মানষের উবগারের জন্য মাদুলি। কোনও পয়সা নেব না। পয়সা পাপ। পাপ। বিনামূল্যে দোব। তা হলে ছড়িয়ে দিই? দি-ই?' হরির লুট দেওয়ার মতো লোকটি দু'আঁজলা ভরা মাদুলি নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে 'এ-ই-ই নেঃ' বলে। কিন্তু ছোড়ে না, হাত মুঠো করেই রাখে। ফলে মাদুলি হাতেই থাকে, ভিড়ে শুধু তোলপাড় ওঠে একবার। অপূর্ব একটি হাসি এবার। 'উঁ হুঁ হুঁঃ। উঁ হুঁ হুঁঃ। ভিড়ে দিলাম হরির লুট, যে পেল সে আমার সম্পক্কে বলবে, লোকটা এম.এ পাশ। বিরাট বিদ্‌ধান। আর যে পেল না? সে বলবে ব্যাটা শুয়োরের বাচ্চা! ওতে আমি নেই। আর মা কামিকখ্যার সেবাইত আমি। তাঁর সেবা চালাতে হয়। সাধককে কিছু দিতে হয়। তাই চারানা করে দাম ধাজ্জ করলাম। চারানা, চারানা, চারানা, চারানা!' হুটোপাটি লেগে গেল চারানা দিয়ে মাদুলি কিনতে। মুঠোভর্তি মাদুলি পলকে শেষ। ভিড়ের মধ্যে এখনও 'আমার একটা', 'আমার একটা' চলছে। লোকটি ঝোলা থেকে বার করল আর এক মুঠো। এবার আটানা,

আটানা। লোকে তাই কিনছে। মুহূর্তে সেটা এক টাকা হল। শেষ পনেরো মিনিট দু'টাকা করে বিক্রি করে লোকটি। তখন ভিড় এত যে রিকশা যেতে পারছে না। লোকটি নিজেই এবার, 'ফাঁকা করো, ফাঁকা করো। যাও, মাদুলি আবার পরে, শনিবার। শনি-মঙ্গলবার আমি আসি। ফাঁকা করো।' এই মাদুলি পাঁচ টাকায় বিক্রি করতেও দেখেছি। শেষ মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে আসা একটি লোককে। ডিমান্ড বাড়লে, চড়চড় করে দাম বাড়বে। সিধে কথা।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু লোকটিকে ছাড়তে পারলাম না। রেলবাজার, কোর্টের সামনে, চাকদা স্টেশনে, গাঙনাপুর, তাহেরপুর, ফুলিয়া, কত জায়গায় তাকে দেখেছি আমি। এর নাম গোপাল। জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। খাড়া বাঁকানো নাক। খোঁচাখোঁচা চুলের বড় মাথা। বলিষ্ঠ গড়ন। ওইটুকু চেহারা নিয়ে, কেবল গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর বাচনভঙ্গি দিয়ে, একেবারে ফাঁকা জায়গায়, পঞ্চাশ-ষাটটা লোক জড়ো করে ফেলত। সম্মোহিতের মতো লোকে কিনত ওর মাদুলি। কিন্তু, সেই সাধককে গোপাল কখনও প্রকাশ্যে আনেনি। সত্যি কোনও সাধকের অস্তিত্ব ছিল কি না, জানা যায়নি কখনও। শনি-মঙ্গলবার হলেই আমি, ওই গোপালের খোঁজে আমি রেলবাজার, কোর্টমোড় যেতাম। পরে, যখন আমার বয়স ২৭-২৮, তখন ট্রেনে চেপে দু'টো-পাঁচটা স্টেশন চলে গিয়ে নেমে পড়তাম। গোপালকে আবিষ্কার করতাম সেখানে। বলা হয়নি, গোপালের লম্বা চুল, ময়লা শার্টের বুক পকেটে একটা টাইম টেবিল থাকত। তার মধ্যে মুখ উঁচিয়ে আছে একটা হাড়। একবার ভিড়ের মধ্যে একজন গোপালের ওই অপূর্ব সম্মোহনী বক্তৃতার সময় অবিশ্বাসের হাসি হাসল। গোপাল থেমে গেল। পকেট থেকে হাড়টা বের করে অবিশ্বাসীর দিকে উঁচিয়ে বলল, 'গেল মঙ্গলবার আমার কাছে এসেছিলেন না আপনি?' অবিশ্বাসী অবাক, 'কই না তো।' 'এসেছিলেন। শুনুন উনি কী বললেন! কী মশাই, বলব সবার সামনে?' ভিড় বলল, 'বলুন বলুন।' অবিশ্বাসী কিছু বুঝতে পারছে না—'হ্যাঁ, কিন্তু, আমি তো আসিনি।' গোপাল চালিয়ে যায়, 'এলেন, এসে বললেন, আমার বাড়ির সামনের বাড়িতে দু'টো মেয়ে থাকে। আমি বললাম, তা কী? উনি বললেন, না, মানে, আমার পানে তাকায়!' এইটি বলার সময় ওই তীক্ষ্ণ চোখ আর দানবীয় মুখে গোপাল এমন একটি লাস্য ও কটাক্ষ তৈরি করল, এমনভাবে একটা আঙুল তুলে রাখল চিবুকে এবং হাসিতে এমন ব্রীড়াবনত হল—আজও ভাবলে তাজ্জব মানি! কী করে পারল! ভিড় হইহই হাসছে। লুটিয়ে পড়ছে ওই ভঙ্গিতে। 'আমি তো বললাম, মেয়েছেলে করবেন, তার জন্য মাদুলি? হবে না। দিতে পারব না।' অবিশ্বাসীর ক্ষীণ প্রতিবাদ হইহইতে অদৃশ্য। সেইসঙ্গে অবিশ্বাসী নিজেও।

আমাদের বন্ধু চাচা ওকে বলত মাজমাওয়ালা গোপাল। মাজমাওয়ালা মানে কী? চাচার একটা নির্বিকার ভঙ্গি ছিল। বলল, 'যারা ভিড় জমিয়ে মাদুলিটাদুলি ব্যাচে, তাদের বলে মাজমাওয়ালা। গোপালদাকে আমি চিনি। খুব ভাল গাঁজা বানায়।'

ক্লাস এইটে পড়ার সময় গোপালের শো দেখতে প্রথম ঢুকি। শো-ই তো! তারপর, আমার ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত যখনই পেরেছি, গোপালের ভিড়ে ঢুকে দাঁড়িয়েছি। গোপালের তখন চুল সাদা, ভুরু নুন-গোলমরিচ। কিন্তু কথা বলতে বলতে দু'দিকে দু'টো হাতের ডানা ভাসানো, চকিতে ঘুরে যাওয়া, চোখের দৃষ্টির মুহুর্মুহু বদল—জীবনে ভুলব না।

ওই যে বলত না, রাতে বাড়ি ফিরছেন, পিছনে ছপছপ ছপছপ—কে আসছে? ঘুরে তাকালেন—কেউ নেই! বলত তো? বলবার সময়টা ভিড়ের মাঝখানের ওইটুকু জায়গায় মাথা ঝুঁকিয়ে দু'টো হাত পিছনে নিয়ে ঠিক তিন থেকে চার পা হাঁটত। সন্দেহগ্রস্তের মতো ওই চার পদক্ষেপ চলার মধ্যেই শেষদিকে চলার গতি কিন্তু আস্তে করে দেবে। যেন ভয় পেল! তারপর সোঁ করে ঘুরে তাকাবে এবং কেউ নেই দেখার পরেকার বিস্ময় ও অধিকতর ভয় ফুটিয়ে তুলবে মুখে। সবটাই দ্রুত। এবং নিখুঁত।



'৮৯ সালে, রানাঘাট থেকে বনগাঁ যাওয়ার ট্রেনরাস্তা। মাঠের মাঝে গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দেখলাম, গোপাল আমার জানলার তলা দিয়ে লাইন পার হল, মাথা নিচু করে আলপথ ধরে চলে যাচ্ছে, শীতের বিকেল নামছে মাঠে। খুবই আশ্চর্য, গোপালের হাতে কোনও ঝোলা নেই।

ওই শেষ গোপালকে দেখেছি। মাজমাওয়ালা গোপাল। মাজমাওয়ালা মানে জানি না। গোপালকেও কি জানি? কিন্তু আমার দেখা সে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। মুখের বিভঙ্গ, ভুরুর বাঁক, চোখ, কপালের খেলা এবং কতরকমের নিঃশব্দ হাসি যে তার আয়ত্তে ছিল! কখনও মুখটা সরু করে অঃ অঃ একটা অসম্ভব হাসত। কখনও বিদ্যুতের মতো, একটা ই-হি-হি-হি। অট্টহাসি কখনও না। বেশিটাই নিঃশব্দ। ওই পথের ভিড়ের চক্রের মধ্যে ঘুরত যেন খোলা তলোয়ার। না মেকআপ, না আলো, না মঞ্চ, না আবহ। সংলাপ, সেও তো তারই বানানো নিশ্চয়। কিন্তু দেখতাম, একই কথা, রোজ একরকম করে বলত না। নানা রকমফের করত। নানানভাবে বার করত একই কথার নানা সুর।

সে হয়তো একজন বুজরুক-ই ছিল। কিন্তু 'মা-টি ফেটে রক্তো উটছে। মা কামিকখ্যা ঋতুমতী হয়েছেন'—এই স্বর এখনও স্বপ্নে কানে আসে। মনে হয় সব সত্যি। দেবীও রজস্বলা হন। গোপাল জানত। সেই গোপাল সেবাইত।

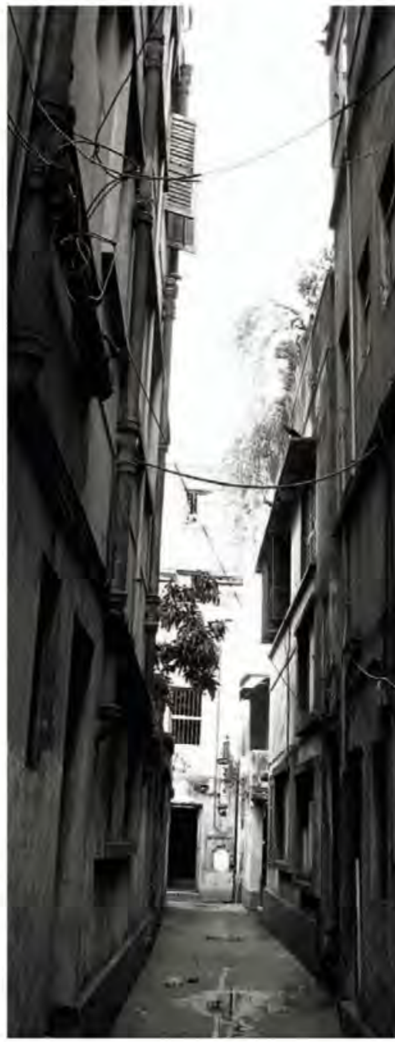


শুরু হল নতুন কলাম।
কলকাতার অলিগলির নামরহস্য।

পার্সিবাগান লেন

এই রাস্তা রুস্তমজি কাওয়াসজি বানাজি (১৭৯২-১৮৫২)-র নামে। তিনি ছিলেন এক প্রথিতযশা পার্সি বণিক। তিনি দ্বিতীয় পার্সি, যিনি মুম্বই থেকে কলকাতায় এসে ব্যবসা ও বসবাস উপলক্ষে থেকে যান। রুস্তমজি প্রথম কলকাতা আসেন ১৮০৬ সালে; একবার মুম্বই ফেরত গিয়ে ১৮০৯ থেকে পাকাপাকি থাকতে শুরু করেন কলকাতায়। চিনদেশের সঙ্গে আফিমের রপ্তানির কারবার ছিল তার, ইহুদি বণিকদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে। ঠিক করলেন আফিম চালান দেবেন নিজের জাহাজে, ভাড়ার জাহাজে নয়। খিদিরপুরে জাহাজ তৈরির পুরনো ডক কিনে সেইখানে তৈরি শুরু করলেন নিজস্ব চিনগামী জাহাজ। কাশীপুরের কেলসল হাউসের পাশেও তাঁর স্টিমার তৈরির ডক ছিল, যে কারণে, পাশের রাস্তাটির নাম হয়েছে রুস্তমজি কাওয়াসজি রোড। বাষ্পীয় পোত ও জীবন-বিমা প্রবর্তন বিষয়ে তিনি এদেশের অগ্রণী একজন। রুস্তমজির বাড়ি ছিল আপার সার্কুলার রোডে। গৃহপ্রবেশের দিন সেখানে বল-ড্যান্সে এসেছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড। এই উদ্যান ভবনের নাম তারপর থেকে হয় পার্সিবাগান। সংলগ্ন রাস্তাটির নাম ১৮৯০ সালে হয় পার্সিবাগান লেন। রুস্তমজি শিল্পপতি ও সমাজসেবী ছিলেন। কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটির মারফত দুঃস্থশালা নির্মাণ আইন ও ভ্যাগ্রান্ট আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন করেন। কলকাতার পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী ও অগ্নি নির্বাপণের জন্য বহু প্রচেষ্টা দেখান ও বহু অর্থ ব্যয় করেন। প্রেসিডেন্সি সার্জন ও ধর্মতলায় নেটিভ হাসপাতালের সার্জন ডঃ জেমস র‍্যানাল্ড লিখিত বই 'নোটস অন দ্য মেডিক্যাল টোপোগ্রাফি অফ ক্যালকাটা অ্যান্ড ইটস সাবার্বস' পড়ে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড 'ফিভার হসপিটাল ও মিউনিসিপ্যাল এনকোয়ারি কমিটি' নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কলকাতার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত হেন বিষয় নেই যা নিয়ে এই কমিটি অনুসন্ধান করেনি। কমিটির ভারতীয় সদস্যদের অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত এবং রুস্তমজি। এই কমিটির উদ্যোগে কলকাতার পথ রাজপথ অলিগলি বস্তি বাগান পুকুর ও স্বাস্থ্য চেতনার মধ্যে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। ঐতিহাসিকতার দিক থেকে পার্সিবাগানের গুরুত্ব ঢের। হিন্দুমেলার নবম অধিবেশন বসে ১৮৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, এই বাগানে। রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে সেই মেলার বর্ণনা লিখেছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন রুস্তমজি। তিনি ১৮৩৫ সালে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৯ সালে ডোমটুলি অর্থাৎ বর্তমান এজরা স্ট্রিটে জমি কিনে তৈরি করেন কলকাতার প্রথম অগ্নি-উপাসনা গৃহ বা আগিয়ারি। এজরা স্ট্রিটের পাশের গলির নাম এখনও পার্সি চার্চ স্ট্রিট।

সংকলন : ঈপ্সিতা হালদার




taste ________
coming soon
Music CDs
O&M 014